গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ১৫-২১ জুন ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সি পি এম-তৃণমূল ‘শান্তি বৈঠক’ কার স্বার্থে

এ রাজ্যের পূর্বতন সিপিএম মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তৃণমূল নেত্রীর বৈঠক সারা রাজ্যে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রশ্ন, সমালোচনা ও আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। এমনকী তৃণমূলের বহু সৎ কর্মী-সমর্থকও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন। আমরা মনে করি, দেশি-বিদেশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের প্রয়োজনে, নির্দেশে ও উদ্যোগে এই বৈঠক সংঘটিত হয়েছে এবং তৃণমূল নেত্রী সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সংগ্রামী গরিব চাষী-খেতমজুরদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে এবং রাজ্যের জনমতকে উপেক্ষা করে সিপিএমের সাথে বোঝাপড়া করতে চলেছেন। বাইরে দেখতে আচমকা টেলিফোনের ডাকে তৃণমূল নেত্রীর সাড়া অনেককে বিস্মিত করলেও বাস্তবে নেপথ্যে এর প্রস্তুতি চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে— এক সিপিএম মন্ত্রীর সাথে আর এক তৃণমূল নেতার ঘনঘন শলা-পরামর্শের মধ্য দিয়ে।

যখন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে নৃশংস অত্যাচার, বহু রক্তপাত ও ব্যাপক খুন-ধর্ষণ ঘটিয়ে সিপিএম এ রাজ্যে ও সমগ্র দেশে প্রবল ধিক্কৃত ও দলের ভিতরে-বাইরে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে মরিয়াভাবে পথ খুঁজছিল সকল অপরাধকে ধামাচাপা দিয়ে, খুন-ধর্ষণে অভিযুক্ত দলীয় ক্রিমিনালদের ও অনুগত পুলিশ কর্তাদের বাঁচিয়ে, পঞ্চায়েত ভোটের আগে ‘শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী’ হিসাবে নিজেদের ইমেজ খাড়া করার এবং খেজুরি থেকে ক্রমাগত বোমাবাজি-গুলিবর্ষণ করে নন্দীগ্রামের আন্দোলনকারীদের তথাকথিত ‘শান্তি বৈঠকে’ বসতে বাধ্য করার চেষ্টাতেও ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন তৃণমূল নেতৃত্ব বৈঠকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিপিএমের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তৃণমূল নেতৃত্ব এমন কথাবার্তা বলছেন, যেন পূর্বতন সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী আজ সিপিএম দলের উর্ধ্বে ‘অভিভাকতুল্য জাতীয় নেতা’, তিনি নন্দীগ্রামে-সিঙ্গুরে কী কী ঘটেছে সব জানতেন না, তৃণমূল নেত্রীর কাছে সব শুনে ন্যায়বিচার করতে চলেছেন! সত্যিই কি তাই! এ রাজ্যের জনগণ জানেন এবং বিশ্বাস করেন, বর্তমান সিপিএম সরকারের সকল সিদ্ধান্তের সাথেই পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী জড়িত, দলের অধিকাংশ সেক্রেটারিয়েট মিটিংয়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং দু’দিন আগেও তিনি রাজ্য সিপিএম নেতাদের মিথ্যা ভাষণের পুনরাবৃত্তি

করে বলেছেন, ‘ধর্ষণের কোনও প্রমাণ নেই এবং ১৪ই মার্চ নিহত ১৪ জন আন্দোলনকারীর মধ্যে ৮ জন পুলিশের গুলিতে ও ৬ জন আন্দোলনকারীদেরই আক্রমণে মারা গেছে।’ এখন তাঁকে সিপিএম থেকে আলাদা করে বর্তমানে ‘সংকটের ত্রাতা’ হিসাবে দেখানো হচ্ছে। তৃণমূল নেত্রী খুশিতে গদগদ হয়ে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী যেন কত মহান এমন ভাব দেখালেন। আর তিনিও সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাষায় ‘দায়িত্বশীল’ প্রধান বিরোধী নেত্রীকে সস্নেহে পিঠ চাপড়ে দিলেন। জনগণের বিক্ষোভকে ভোটের রাজনীতিতে আটকে রাখার বুর্জোয়া স্বার্থে দেখানো হচ্ছে, কেন্দ্রে যেমন কংগ্রেস ও বিজেপি, তেমনই এ রাজ্যেও সিপিএম আর তৃণমূল, আর কেউ নেই। মনে রাখতে হবে, সিপিএমের কোনও নেতা ভাল, আবার কোনও নেতা মন্দ— এরকম বিচার করার কোনও সুযোগ নেই। মার্কসবাদ বর্জিত ও বামপন্থাচ্যুত গোটা দলের চূড়ান্ত জনবিরোধী গদিসর্বস্ব রাজনীতিই আজ দলকে এ জায়গায় টেনে নামিয়েছে, যার ফলে সরকারি দল হিসাবে কংগ্রেস, বিজেপি ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলের সাথে সিপিএমের কার্যত কোনও পার্থক্য থাকছে না।

প্রচার করে করে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, যেকোনওভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অনেক সৎ মানুষও তাই ভাবছেন। এর ফলে চাপা পড়ে যাচ্ছে, কে কীভাবে জনজীবনে বাস্তবে অশান্তি সৃষ্টি করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে কোন্ শান্তি কাম্য? বহুকথিত এই শান্তি সম্পর্কে জনগণ, দেশি-বিদেশি

সাতের পাতায় দেখুন

আইনের দোহাই দিয়ে সিটু খুচরো ব্যবসায় একচেটিয়া পুঁজিকে সমর্থন জানাচ্ছে

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

সিপিএম-এর শ্রমিক সংগঠন কিছু মামুলি শর্ত জানিয়ে খুচরো ব্যবসায় একচেটিয়া পুঁজির প্রবেশকে আইনের দোহাই দিয়ে সমর্থন জানিয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে মন্দাজনিত সঙ্কটের কারণে আজ একচেটিয়া পুঁজিপতিরা উদ্বৃত্ত পুঁজিকে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়, নগর-সড়ক-ব্রীজ নির্মাণে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবসায় যেমন বিনিয়োগ করছে, তেমনি কৃষিপণ্য থেকে শুরু করে মুদিখানা, মনোহারি, জামাকাপড়, ওষুধ, প্রসাধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উৎখাত করে সমগ্র ব্যবসাক্ষেত্রকে গ্রাস করতে চাইছে। এর ফলে আনুমানিক ৭০০ চালকল ও ৫০০ হিমঘর বন্ধ হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে। ধীরে ধীরে একচেটিয়া পুঁজি কৃষিপণ্য উৎপাদনেও নিজেদের কন্ট্রোল কায়েম করবে। প্রথমদিকে তারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-দোকানদার এবং খুচরো ব্যবসায়ীদের কম্পিটিশানে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কৃষকদের কিছু বেশি দাম ও ক্রেতাদের কম দাম দেবে, তারপর বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপনের পর কৃষকদের কম দাম দেবে ও ক্রেতাদের বেশি দামে বিক্রি করবে। অন্যান্য রাজ্যের কংগ্রেস, বিজেপি সরকারের ন্যায় এরাজ্যে সিপিএম সরকার একচেটিয়া পুঁজির এই ভয়াবহ আক্রমণকে কার্যকর করতে চলেছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং দাবি করছি, (১) কৃষিপণ্য সহ পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার কোন ক্ষেত্রেই দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের ঢুকতে দেওয়া চলবে না, (২) খাদ্যদ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে।

চা-বাগানে এত মৃত্যু কি অনিবার্য ছিল

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে বন্ধ হওয়া ১৪টি চা-বাগানে ১ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে ৩১ মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত ৪৫৫ দিনে মোট ৫৭১ জন শ্রমিক অনাহারে ও অপুষ্টিতে মারা গেছেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন একজনের বেশি শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে। এই হিসাব খোদ জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের। ২০০২ সাল থেকে যখন মালিকদের বাগান বন্ধ করার ধুম পড়ে যায়, তখন থেকে হিসাবে ধরলে মৃত্যুর সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি।

এই মৃত্যু কি অনিবার্য ছিল? বাগানের শ্রমিকরা বারবার সিপিএম সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে, বাগান খুলতে মালিকদের বাধ্য করার জন্য। চা-শ্রমিকদের সংগ্রামী সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত নর্থ বেঙ্গল টী প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন বাগান বন্ধের সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে ডেপুটেশন, অবস্থান, ধরনা, আইনঅমান্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বারবার দাবি জানিয়েছে যে, মালিকরা বাগান না চালু রাখলে চুক্তি অনুযায়ী সেগুলির লীজ বাতিল করা হোক এবং সরকার সেই বাগান অধিগ্রহণ করে খোলার ব্যবস্থা করুক। কিন্তু সরকার কোন মালিকের লিজ বাতিল করেনি, কোন বাগানই অধিগ্রহণ করেনি। ফলে কাজ নেই, বেতন নেই, রেশন নেই, চিকিৎসা নেই — অর্ধাহারে-অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরছে এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে উত্তরবঙ্গে বন্ধ হওয়া চা-বাগানের শ্রমিকরা।

১৫ মাসে মৃত্যুর খতিয়ান

(১/১/০৬ - ৩১/৩/০৭)

১।	রায়মাটাং	চা-বাগান	৬৫
২।	চিঙ্গুলা	,,	৩৪
৩।	কালচিনি	,,	৭০
৪।	সামসিং	,,	৩৭
৫।	ঢেকলাপাড়া	,,	২৭
৬।	রামঝোড়া	,,	৩৬
৭।	বামনডাঙা-তন্দু	,,	৩৮
৮।	শিকারপুর-ভাণ্ডাপুর	,,	৩৮
৯।	চামুর্চি	,,	২৯
১০।	সুরেন্দ্রনগর (১৭/৩/০৭-এ খুলেছে)		৫
১১।	কাঁঠালগুড়ি	,,	৫৩
১২।	রেডব্যাঙ্ক	,,	৩১
১৩।	রায়পুর	,,	২৯
১৪।	ভর্ণাবাড়ি	,,	৭৯
	মোট	,,	৫৭১

(জলপাইগুড়ি স্বাস্থ্যদপ্তরের সমীক্ষা সূত্র ঃ টেলিগ্রাফ ৬-৬-০৭)

ডুয়ার্স এলাকার প্রায় সব বিধায়কই সিপিএম এবং আরএসপির। চা-শ্রমিকদের প্রশ্ন, শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা রক্ষায় কী ভূমিকা পালন করেছেন এঁরা? রাজ্যে সরকার কী করতে আছে? সরকার কি আছে শুধু মালিকের মুনাফা কীসে পাহাড়প্রমাণ হয় তার ব্যবস্থা করতে? টাটা-সালেম-আম্বানিদের জন্য কৃষক উচ্ছেদ করে জমি দিতেই যদি সরকার মশগুল থাকবে এবং শ্রমিকদের মৃত্যু অনাহারে নয় রোগে — এরূপ প্রহসনই করবে, তাহলে এই সরকার শ্রমিকদের কী প্রয়োজন?

কয়েক মাস আগে রাজ্যপাল শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধী উত্তরবঙ্গে গিয়ে চা-বাগানে মৃত্যুর সংবাদে বিচলিত হয়ে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

ছয়ের পাতায় দেখুন

টাটার কারখানায় উৎপাদন কমছে, বাড়ছে ছাঁটাই ও আত্মহত্যা

সিঙ্গুরে টাটা মোটরস্-এর জমি নেওয়াকে কেন্দ্র করে কৃষক বিক্ষোভ দমন করতে বুদ্ধদেববাবুর সরকার একদিকে যেমন পুলিশের অত্যাচার নামিয়ে এনেছে, অন্যদিকে কৌশল ও প্রতারণার সাহায্য নিচ্ছে। “টাটা ভালো পুঁজিপতি” বলে যে সার্টিফিকেট তারা দিচ্ছে — সেটাও এই রকমেরই একটি কৌশল। জামশেদপুরের টাটা মোটরস্-এর কারখানা ও শহর দেখিয়ে বলা হচ্ছে যে, সেখানে হাজার হাজার লোক চাকরি পেয়েছে, ঘর পেয়েছে এবং তারা সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। সিঙ্গুরে টাটা মোটরস্-এর কারখানা হলেও ঠিক একইভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। এই প্রচারে কিছু লোককে তারা সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি টাটা মোটরস্-এর জামশেদপুর ইউনিটের ছাঁটাই হওয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলনে আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান

মেদিনীপুর জেলা

২৬ মে তমলুকে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সর্বস্তরের বিদ্যুৎ-গ্রাহকদের ১২তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। মহেন্দ্র স্মৃতি সদনে আয়োজিত এই সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে বিশেষভাবে আলোচিত হয় হরিপুরে প্রস্তাবিত পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রসঙ্গ। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ এবং যাদবপুর এনার্জি স্ট্যাডিজ-এর ভূতপূর্ব ডিরেক্টর অধ্যাপক সুজয় বসু। তিনি বর্তমান বিশ্বে পরমাণু বিদ্যুতের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার অসংখ্য ঘটনা তুলে ধরে দেখান যে, এই প্রকল্প আসলে একটি করে বিপুলায়তন পরমাণু বোমা। এর ভয়াবহতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই সর্বনাশ চাপিয়ে দিচ্ছে দেশবাসীর ঘাড়ে অত্যন্ত গোপনীয়তার আশ্রয়ে। যে কোন মূল্যে এই ভয়ঙ্কর প্রকল্প প্রতিরোধ করতে হবে।

সম্মেলনের প্রধান বক্তা অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, বিদ্যুৎ পরিষেবাকে চূড়ান্তভাবে বাজারের পণ্যে পরিণত করছে রাজ্য সরকার। জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ পর্ষদকে পুরোপুরি তিনটি কোম্পানিতে ভেঙে দিয়েছে। সবগুলি কোম্পানিই বিপুল পরিমাণ লাভ করতে মাশুলবৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। এর ফলে তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপনীতিতে বৃহৎ শিল্পপতিদের বিদ্যুৎ মাশুল কমিয়ে সেই টাকা গরিব মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে আদায়ের চক্রান্ত চলছে। এর প্রতিরোধে অ্যাবেকা আগামী ২৫ জুন থেকে ১ জুলাই সপ্তাহব্যাপী লাগাতারভাবে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। একে সফল করার জন্য তিনি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রতি আহ্বান জানান।

সাধারণ সম্পাদক অমল মাইতি বলেন, ইতিপূর্বে অ্যাবেকার আন্দোলনের চাপে বহু দাবি আদায় হয়েছে। বর্তমানে লোডশেডিং মুক্ত বিদ্যুৎ এবং গৃহস্থ, ক্ষুদ্রশিল্প, ছোট দোকানদারকে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ, কৃষিতে ৩ একর পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং পরবর্তী স্তরে ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুতের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক মধুসূদন মান্না। সভাপতিত্ব করেন জেলা সহসভাপতি মহাদেব সামন্ত।

হুগলি জেলা

গত ২-৩ জুন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শ্রীরামপুরে। ২ জুন আর এম এস মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন হুগলি জেলা সংগঠনের অন্যতম সহসভাপতি শিক্ষক রবিরাম কাঁড়ার। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন হুগলি জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মণিমোহন ঘোষ। রাজ্য সম্পাদক অমল মাইতি তাঁর ভাষণে গণআন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং এই অনুকূল পরিস্থিতিকে সদ্ব্যবহার করে বিদ্যুৎগ্রাহকদের ওপর সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য সকলকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রধান বক্তা সংগঠনের সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস অ্যাবেকার গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলির উৎস হল বিশ্বায়নের নামে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ।

প্রকাশ্য সমাবেশের পর প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয় শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশনে। রবিরাম কাঁড়ার, মহাদেব কোলে এবং মণিমোহন ঘোষ — এই তিনজনের সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন জেলা কমিটির সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। মোট ১৭ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। সর্বশেষ বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক অমল মাইতি।

কমলকৃষ্ণ মল্লিককে সভাপতি এবং প্রদ্যুৎ চৌধুরীকে সম্পাদক করে মোট ৪৫ জনের হুগলি জেলা কমিটি গঠিত হয়। সভায় সমাপ্তি ভাষণ দেন রাজ্য সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস।

দাদপুর থানা

কৃষিতে ৫০ পয়সা ইউনিট, ক্ষুদ্র শিল্প ও গৃহস্থদের এক টাকা দরে বিদ্যুৎ এবং লো ভোল্টেজের জন্য কৃষিতে সেচের অভাবে ফসল নষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে হুগলি জেলার দাদপুর থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৭ মে পুঁইনান বেসিক স্কুলে। প্রবল তাপপ্রবাহ অগ্রাহ্য করে দুই শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহকের উপস্থিতিতে সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন শচীন সরকার।

মূল প্রস্তাব পাঠ করেন থানা কমিটির সম্পাদক শেখ জাহাঙ্গির। প্রস্তাবের সমর্থনে ১১ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় অংশে বক্তব্য রাখেন মণিমোহন ঘোষ, মহিউদ্দিন মোল্লা, মহাদেব কোলে প্রমুখ জেলা নেতৃবৃন্দ। হুগলি জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী বলেন, বিদ্যুৎগ্রাহকদের উপর এই আক্রমণকে দেশের মূল সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে আজকের চাষীর জমিরক্ষার লড়াই এই একই লড়াইয়ের অঙ্গীভূত। সভার প্রধান বক্তা অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস তাঁর ভাষণে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সমস্যার দ্বারা ভাবিত না হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, এই আন্দোলন বহু সমস্যার যেমন সমাধান করেছে, তেমনই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পারস্পরিক ভরতুকি বিলোপের নামে নয়া বিদ্যুৎনীতি নানা সমস্যার জন্ম দিয়েছে। আমাদের আন্দোলনের ফলে সরকার এই নীতি পুরোপুরি কার্যকর করতে পারেনি। শচীন সরকারকে সভাপতি এবং শেখ জাহাঙ্গিরকে সম্পাদক করে ৩৩ জনের থানা কমিটি গঠিত হয়।

শহীদ দীনেশ মজুমদার জন্মশতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

শহীদ দীনেশ মজুমদার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে ১৫ - ১৯ মে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট টাউন হলে অগ্নিযুগের বিপ্লবী, 'যুগান্তর' দলের অন্যতম সদস্য শহীদ দীনেশ মজুমদারের জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। ১৫-১৬ মে মহকুমাব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কয়েক শত ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ১৭ মে শহীদ দীনেশ মজুমদারের পিতার নামাঙ্কিত পূর্ণচন্দ্র গার্লস হাইস্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শত শত ছাত্র-ছাত্রী বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সাধারণ মানুষ বর্ণাঢ্য প্রভাত-ফেরীতে অংশগ্রহণ করে বসিরহাট টাউন হলে এসে শহীদের মর্মরমূর্তিতে মাল্যদান করেন। ঐদিন বিকালে 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর, সাহিত্যের ও শিক্ষকের ভূমিকা' শীর্ষক এক মনোজ্ঞ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা শহীদ ভগৎ সিং জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক ডঃ মৃদুল দাস। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ১৮ মে নানা অনুষ্ঠান হয়। ১৯ মে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সারা বাংলা মাষ্টারদা সূর্য সেন জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য স্বাধীনতা আন্দোলনে শহীদ দীনেশ মজুমদারের ভূমিকা ও বর্তমানে তার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি তুলে ধরেন।

বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অরূপ মজুমদার সহ বিভিন্ন শিল্পীরা অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন যুগ্ম সম্পাদক পিনাকী প্রসাদ দাস, হিরন্ময় দাস এবং অমরেন্দ্র নাথ দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি অমলেন্দু প্রসাদ রায়। শতবার্ষিকী কমিটি দীনেশ মজুমদারের জীবনীগ্রন্থ, ফটো ও শতবর্ষ স্মারকব্যাজ প্রকাশ করে। স্থানীয় প্রশাসন বসিরহাট স্টেডিয়ামের নামকরণ করেন শহীদ দীনেশ মজুমদার স্টেডিয়াম।

নামখানায় ডেপুটেশন ঃ ব্যবস্থা নিচ্ছেন বিডিও

দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা-নারায়ণপুর ফেরিঘাটে ভাড়াবৃদ্ধি সহ ৯৪ রুটের বাসভাড়া বৃদ্ধি এবং মৌসুনী-বালিয়াড়া নদীবাঁধ মেরামতে দুর্নীতির প্রতিবাদে গত ২৪ মে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ফেরিঘাটটি পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা চালিত। ভাড়া ২৫ পয়সা। স্পেশাল খেয়ার জন্য দিতে হয় আরও ২৫ পয়সা। তারা প্রচার করেছিল, ৪ জুন থেকে দাঁড়ের বদলে যন্ত্রচালিত খেয়া চলবে, ভাড়া হবে ১ টাকা। অন্যদিকে মৌসুনী-বালিয়াড়ায় নদীবাঁধ ভেঙে হাজার হাজার মানুষ জলে ভাসে; এখন সেখানে নাবার্ড থেকে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে বাঁধ মেরামতের যে কাজ চলছে তাতে পাথরকুচির নাম করে কাঠ-কয়লা মেশানো নিম্নমানের সিমেন্ট ও ইট ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। সিপিএম, তৃণমূল ও কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্টর-ঠিকাদারদের ঘনিষ্ঠতা সাধারণ মানুষ জানেন; তাই তাঁরা এই দলগুলির কাছে না গিয়ে এস ইউ সি আই নেতৃত্বের কাছে আসেন এবং হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান।

এরই ফলশ্রুতিতে ২৪ মে'র ডেপুটেশন। বিডিও অবিলম্বে নদীবাঁধ মেরামতির কাজ পরিদর্শন করার এবং বাসভাড়াবৃদ্ধির বিষয়টি এসডিও'র নজরে এনে প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেন। খেয়াভাড়ার বিষয়ে বিডিও একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন এবং তাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব ভাড়া ২৫ পয়সাই থাকবে, তা বাড়ানো হবে না; স্পেশাল খেয়ার ভাড়াই শুধু বাড়বে।

আসামে বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে এস ইউ সি আই

বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে এস ইউ সি আই আসাম রাজ্য কমিটি আন্দোলনে নেমেছে। বিদ্যুৎসঙ্কটের সমাধান, নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিলের দাবিতে ১৫ মে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করে এস ইউ সি আই। এদিন সুসজ্জিত মিছিল পানবাজার, পল্টনবাজার হয়ে উলুবাড়িতে শেষ হয়। তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডিসি অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। গোয়ালপাড়াতে পাঁচ শতাধিক কর্মী-সমর্থক কমরেড চন্দ্রলেখা দাসের নেতৃত্বে ডি সি অফিসে ডেপুটেশন দেয়। মঙ্গলদৈ-এ কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ কাকতির নেতৃত্বে ডেপুটেশন হয়। ধুবড়িতে ডি সি অফিসের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। সেখানে কমরেডস্ জয়নাল আবেদিন, সুরতজ্জামান মণ্ডল, আজাহার হোসেন নেতৃত্ব দেন। মানকার চরে আসাম স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন কমরেড মিনহার আলি মণ্ডল। এছাড়া নগাঁও, তেজপুর, লখিমপুর, করিমগঞ্জে অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মী-সমর্থক ও দরদী মানুষদের অভিনন্দন জানিয়ে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

যৌন শিক্ষার প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ

৩০ এপ্রিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভবনের সামনে ছাত্র ও মহিলাদের বিক্ষোভ

সরকারি কৃষিনীতির পরিণামে

হাজার হাজার কৃষক আত্মঘাতী

দেশজুড়ে কৃষির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং গত ২৯ মে দিল্লিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায়। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সম্পর্কে সংবাদপত্রের রিপোর্ট ঃ 'খুব শীঘ্রই একটি খাদ্য নিরাপত্তা মিশন প্রকল্প চালু করবে ইউপিএ সরকার। তার পাশাপাশি আজই ২৫ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসে স্থির হবে, কৃষির উন্নয়নে রাজ্য আরও কত ব্যয় করবে, (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ মে ২০০৭)।

প্রশ্ন হল, এই পরিকল্পনায় কৃষি ও কৃষকের সত্যিকারের উন্নয়নের কি কোন ব্যবস্থা আছে? অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে মানসিক অবসাদে এ পর্যন্ত যে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছেন, তাঁদের পরিবারগুলিকে ঋণের ফাঁদ থেকে রক্ষার, কিংবা আরও যে হাজার হাজার কৃষক বাধ্য হয়ে আত্মহননের পথে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের বাঁচাবার কোন সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা কি প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়েছে? সার-বীজ-কীটনাশকের লাগামছাড়া দামবৃদ্ধি, সেচের অভাব, ফসলের ন্যূনতম দাম না পাওয়া, বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা প্রভৃতি যে সমস্যাগুলি হাজার হাজার কৃষককে আত্মঘাতী হতে বাধ্য করেছে, সেগুলির সমাধানের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও কি এই ঘোষণায় আছে? এগুলি যদি না থাকে, তবে সেই ঘোষিত পরিকল্পনায় 'কৃষির উন্নয়ন' ঘটবে কী করে? দলে দলে কৃষক অকালে মরতে থাকবে, সেই মৃত্যুর পথ বন্ধ করা হবে না, অথচ 'কৃষির উন্নয়ন' হবে — এই যদি সরকারের ভাবনা হয়, তাহলে এই উন্নয়নে কার উন্নয়ন হবে?

কংগ্রেস শাসিত মহারাষ্ট্র কৃষকের আত্মহত্যার মর্মান্তিক দলিল

'কৃষির উন্নয়নে'র নামে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় বাস্তবে কৃষি ও কৃষকের যথার্থ উন্নয়নের যেমন কোন পরিকল্পনা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ঠিক তেমনি গত বছর (২০০৬) মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে গিয়ে তিনি আত্মঘাতী কৃষকদের অসহায় পত্নীদের সামনে যে ঘোষণা করেছিলেন তাতেও কৃষি ও কৃষকের যথার্থ উন্নয়নের কোনও ছাপ ছিল না। ২০০২ থেকে ২০০৬ — এই পাঁচ বছরে মহারাষ্ট্রের শুধুমাত্র বিদর্ভের ৬টি জেলা — আকোলা, অমরাবতী, বুলদানা, যবৎমাল, ওয়াসিম এবং ওয়ার্ধায় আত্মঘাতী হয়েছেন অন্তত ২১৫০ জন কৃষক। সেখানে কেবলমাত্র গত বছর অর্থাৎ ২০০৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা ৭৯৩ জন (সূত্র ঃ সানডে টাইমস, ৮-১০-০৬)। গত বছর ৩০ জুন প্রধানমন্ত্রী যখন বিদর্ভে যান তুলাচাষীদের দুর্দশার খোঁজখবর নিতে, তখন তাঁর সামনে ৫৩০ জন আত্মঘাতী কৃষকের বিধবা অসহায় পত্নীরা হাজির হয়েছিলেন। গঙ্গাবাঈ চন্দক অঝোরে কেঁদেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সামনে; বলেছিলেন, 'কৃষিতে পরপর কয়েক বছর লোকসান হওয়ায়, তিন মাস আগে আমার স্বামী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। মৃত্যুকালে তিনি মাথার ওপর বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা আর পাঁচ নাবালিকা কন্যাকে রেখে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছে; তার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য আমার ছিল না। আমি নিজেই এখন বাকি সন্তানদের নিয়ে আত্মহত্যার কথা মাঝে মাঝে ভাবি। এছাড়া আর কোন্ পথই বা আমার আছে?' সব শুনে প্রধানমন্ত্রী কী করেছিলেন? ৩৭৫৯ কোটি টাকার এক প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে মাত্র ৭১২ কোটি টাকার সুদ মকুবের ঘোষণা; তাও আবার বলবৎ ছিল ২০০৬-এর জুন মাস পর্যন্ত। আত্মঘাতী কৃষকদের ঋণের সুদ ছাড় দেওয়া হলেও তাদের নিঃস্ব রিক্ত অসহায় পরিবারগুলি পাহাড়প্রমাণ ঋণ কোথা থেকে কীভাবে মেটাবে, আর নতুন করে চাষই বা কী করে শুরু করবে, সারা বছর সন্তান ও পরিবারবর্গকে কী খাওয়াবে, কিংবা ঋণগ্রস্ত অন্য কৃষকেরা কীভাবে বাঁচবে — তার কোন সুরাহার ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় সেদিন ছিল না। সেই ঘোষণার মধ্যে চাষীরা বাঁচার কোন রাস্তাই দেখতে পায়নি। তাই প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজ ঘোষণার পরদিনই ১ জুলাই-এর সংবাদ — আরও ১০২ জন কৃষক ঋণের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছেন।

আবার, আত্মঘাতী কৃষকদের ক্ষতিপূরণের প্রশ্নেও চরম অবহেলা ও উদাসীনতা দেখা গেছে।

আত্মঘাতী কৃষকদের পরিবারগুলির অধিকাংশই সরকারের থেকে কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি। সরকার ও প্রশাসনের যুক্তি ঃ এদের অধিকাংশই জমির মালিক নয়। এদের নামে আইনত কোন জমি নেই। এরা জমি লিজে নিয়ে চাষ করেছে, নয়তো বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত জমিতে করেছে, যা আইনত ঐ আত্মঘাতী কৃষকের নামে নেই। ফলে, এদের আত্মহত্যাকে 'কৃষকের আত্মহত্যা'র তালিকায় রাখা যাচ্ছে না (সূত্র ঃ দি হিন্দু, ২৪ মে ২০০৭)। অর্থাৎ সরকারি বিচারে, যারা চাষ করে তারা চাষী নয়, যাদের নামে জমি লেখা আছে তারাই চাষী; এবং তারা আত্মঘাতী হলে তবেই আইনত ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসে। এরই সুযোগ নিয়ে ঢাক পিটিয়ে ক্ষতিপূরণের ঘোষণাও করা হল, আবার আইনের ফাঁক দেখিয়ে ক্ষতিপূরণও দিতে হল না। কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিন্ত! যাদের সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে এই সরকার টিকে আছে, সেই সিপিএমও এ ব্যাপারে কার্যকর কিছু করছে না। তারা সরকারকে চাপ দিয়ে প্রতিটি আত্মঘাতী কৃষকের পরিবারকে অন্তত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করাতে পারত, তা কিন্তু তারা করেনি। বিজেপি-তৃণমূল জোটও নীরব থেকে 'দায়িত্বশীল বিরোধী দল' হিসাবে 'ইতিবাচক' ভূমিকা পালন করেছে।

কংগ্রেস শাসিত অন্ধ্রপ্রদেশেও ৩০০০ কৃষক আত্মঘাতী

কংগ্রেস শাসিত আর একটি রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ। ফসলের ন্যূনতম দাম না পেয়ে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে এ রাজ্যে ১৯৯৭ থেকে ২০০০ — এই চার বছরে আত্মহত্যা করেছে তিন হাজারেরও বেশি কৃষক। এই সময়ে অনন্তপুর জেলাতেই আত্মঘাতী হয়েছে ১৮২৬ জন প্রান্তিক চাষী। এই রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের তিনটি গ্রামে — রেস্তাছিলতালা, খান্ডামাপাড়ু ও মাছেরলায় ১০০ জনেরও বেশি কৃষক নিজেদের কিডনি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া, শত শত কৃষক ব্যাঙ্কের ঋণ, সুদ সহ মেটাতে না পারায় তাদের জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে। নালাপ্পা রেড্ডি এমনই একজন কৃষক। তাঁর কথায়, 'জলসেচ, বিদ্যুৎ ও চাষের অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় অবস্থা ভীষণ খারাপ।' তারপর দেখা দিল জলের সঙ্কট। 'আমি ৪/৫ বছরের মধ্যে ৩২টি কূপ বসালাম ১০ একর জমিতে। সবগুলোই অকেজো হয়ে গেল।' নালাপ্পা আরও বলেছেন, '৯০-এর দশক পর্যন্ত মোটামুটি ভালই চলছিল। ...কিন্তু তার পরের ১৫ বছর আমাদের সব শেষ করে দিয়েছে।' স্পষ্ট হয়ে যায়, মোটামুটি স্বচ্ছল এইসব চাষীদেরও সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে ৯০-এর দশকে চালু হওয়া সরকারের উদার আর্থিক নীতি এবং এর ফলে গরিব সাধারণ প্রান্তিক চাষীদের যে দুরবস্থা হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নালাপ্পা-র স্পষ্ট অভিযোগ, উদার আর্থিক নীতির নামে 'সমস্ত সরকারি নীতি কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হচ্ছে। এখানকার সমস্ত কৃষকদের একই অবস্থা।' তাই তিনি অনন্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ সময়মত মেটাতে পারেননি। অতএব, অন্যান্য বহু চাষীর মতই নালাপ্পার স্থান হয়েছিল জেলখানায়। সংবাদমাধ্যমে তাঁর ঘটনাটি ব্যাপক প্রচার লাভ করায় তিনি আপাতত জেলের বাইরে বেরোতে পারলেও বাকিরা আজও জেলে। অন্ধ্রপ্রদেশ রুথু সংঘম্-এর সাধারণ সম্পাদক মাল্লা রেড্ডি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, 'ব্যাঙ্কগুলো অভাবী চাষীদের ওপর জবরদস্তি করছে, তাদের জেলে ঢোকাচ্ছে। মনে রাখবেন, এরা খরাপীড়িত এলাকার চাষী; এদের হাতে ফসল নেই, ঋণ মেটাবার ক্ষমতাও নেই। মাত্র হাজার কয়েক টাকার জন্য এদের জেলে পোরা হচ্ছে। অথচ, যারা কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কঋণ নিয়ে বসে আছে, শোধ করছে না — সেই বড় বড় শিল্পপতিদেরকে এই ব্যাঙ্কগুলি স্পর্শও করে না।' সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশ ঋণ উদ্ধার ট্রাইব্যুনাল ২০০ জন ভিআইপি, শিল্পপতি, কন্ট্রাক্টর ও রাজনৈতিক নেতার নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে — যারা ব্যাঙ্কের থেকে ১০০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করছে না। সেই টাকা উদ্ধারের কোন উদ্যোগও সরকারের নেই।

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে সাইনাথ রেড্ডি তাঁর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেছেন, 'সরকার আমাদের নিয়ে এতটুকু ভাবছে না। তারা চাইছে — পুঁজিপতিরা এসে কৃষির দখল নিক। তাদের এই লক্ষ্য পূরণের পথে আমরা এখন জঞ্জাল' (সূত্র ঃ দি হিন্দু, ৫ মে, ২০০৭)।

বিজেপি শাসিত রাজস্থান ও গুজরাটে দুই সহস্রাধিক কৃষক আত্মঘাতী

এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি রাজ্যের সরকারি ক্রিয়াকলাপে অত্যন্ত স্পষ্ট। শুধু কংগ্রেসী রাজ্যগুলিতে নয়, বিজেপি শাসিত রাজস্থানেও এই একই ঘটনা ঘটছে। সেখানে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ — এই তিন বছরে প্রায় ২০০০ কৃষক দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেছে। গুজরাটে কেবল ২০০৬ সালে আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা সরকারি মতে ১৪৮, বেসরকারি মতে তিন শতাধিক।

পাঞ্জাবেও আত্মহত্যার থেকে কৃষকদের রেহাই নেই

আবার, যে পাঞ্জাবে কখনও কংগ্রেস, কখনও বিজেপি-আকালি জোট ক্ষমতায় থেকেছে, সেখানেও চাষের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, আয় হ্রাস, ফসল না হওয়ার কারণে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে গত ৫ বছরে আত্মঘাতী হয়েছে সরকারি হিসেবে ১৩২ জন কৃষক। অন্যদিকে, কয়েকমাস আগে পাঞ্জাবভিত্তিক এনজিও 'মুভমেন্ট এগেনস্ট স্টেট রিপ্রেশন' তাদের রিপোর্টে এক ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরে দেখিয়েছে ঃ ১৯৮৮ থেকে ২০০৬ — এই ১৮ বছরে শুধুমাত্র সাংগ্রুর জেলার মুনাক সাবডিভিশনের ৯৩টি গ্রামে আত্মঘাতী হয়েছে ১৪৪৫ জন কৃষক (সূত্র ঃ হিন্দুস্তান টাইমস্, ৫ জুন ২০০৭)।

সিপিএম শাসিত পশ্চিমবঙ্গেও কৃষকদের আত্মহত্যা করতে হচ্ছে

দীর্ঘ ৩০ বছর সিপিএম শাসিত পশ্চিমবঙ্গেও ঋণের চাপে কৃষক ও খেতমজুরদের অবস্থা করুণ। চাষের জন্য ব্যবহৃত সার-বীজ-কীটনাশক ক্রমাগত অগ্নিমূল্য। এমনকী যে বীজ সরকারের কৃষিদপ্তরই সরবরাহ করেছে — তাও অনেক ক্ষেত্রেই বাঁজা। জল, সার, কীটনাশক চড়াদরে কিনে চাষ করার পরও এই বাঁজা বীজের কল্যাণে মাঠে গাছ হলেও ফলন আদৌ হয়নি, নয়তো অতি সামান্য পরিমাণ হয়েছে। আবার যে সব ফসলের ফলন ভাল হচ্ছে, সেই আলু, টমেটো, করলা, কপি ইত্যাদি বাজারে বেচতে এসেও চাষী চাষের খরচটুকু পর্যন্ত পাচ্ছে না। ফলন মার খেলে তো তারা বিপদে পড়েই, আবার ভাল ফলন হলেও তাদের বিপদ। ধনী কৃষি-ব্যবসায়ী ও তাদের এজেন্ট ফড়ে ও দালালরা পরিকল্পিতভাবে ফসলের দাম কমিয়ে রেখে চাষীদের সর্বস্বান্ত করে। অথচ মহাজনের থেকে চড়াসুদে ঋণ নিয়ে তারা চাষ করেছিল। দাম না পেয়ে তারা জড়িয়ে পড়ে ঋণের ফাঁদে। সারা বছর সংসার চালাবে কেমন করে, ঋণ ও ঋণের সুদ মেটাবে কেমন করে! কোথাও কোন আশার আলো দেখতে না পেয়ে ইতিমধ্যে কয়েকজন চাষী আত্মহত্যা করেছেন। ২০০২ সালে কোচবিহারের করলা চাষী রামেশ্বর বর্মন, ২০০৩ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা টাউন থানার আলুচাষী শিবহরি চৌধুরী, ২০০৪-এ বর্ধমানে জামালপুরের আলুচাষী সৈফুদ্দিন চৌধুরী, মেমারি ব্লকের আলুচাষী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কালনা ব্লকের আলুচাষী যুধিষ্ঠির দেবনাথ, ২০০৬-এ বর্ধমানেরই রায়না ২নং ব্লকের আলুচাষী কাশীনাথ পান, মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার দিনমজুর বিনয় রায় আত্মঘাতী হয়েছেন। ঐ বছরই হুগলির আরামবাগে বাতানলের বেঙ্গা গ্রামে দেনার দায় থেকে মুক্তি পেতে উত্তম কুণ্ডু — তাঁর স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান সহ আত্মঘাতী হয়েছেন।

এ বছর (২০০৭) জুন মাসের ৪ তারিখে

ছয়ের পাতায় দেখুন

নন্দীগ্রাম গণআন্দোলনের তীর্থস্থান

নন্দীগ্রামের জনসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

(এস ইউ সি আই-এর মেদিনীপুর জেলা কমিটির আহ্বানে গত ৩০ মে নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০ হাজার মানুষের এই সমাবেশে নন্দীগ্রামের জনগণের ঢল নেমেছিল। তাদের উপস্থিতিতেই মাঠ ছাপিয়ে যায়। আশপাশের বাড়ির ছাদ ও পাঁচিলেও মানুষ বসে-দাঁড়িয়ে বক্তব্য শোনেন। জেলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশ কিছু মানুষও এই সভায় যোগ দেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কলকাতার কিছু পার্টি কর্মীও গিয়েছিলেন। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর ভাষণ কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে প্রকাশ করা হল।)

আপনারা জানেন, ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের সময় থেকেই দেশের ইতিহাসে মেদিনীপুর জেলা এক অতি উজ্জ্বল স্থান দখল করে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্তী স্তর থেকেই সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের পূর্বদিগন্তে উদীয়মান সূর্যের মতো নবজাগরণের পুরোধা হিসাবে যাঁর অভ্যুদয় ঘটেছিল, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান এই জেলাতেই। এই জেলাতেই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম নিয়েছিলেন মহান শহীদ কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, যিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র সহ অসংখ্য বিপ্লবী যোদ্ধার অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন। এই জেলার মৃত্যুঞ্জয় যৌবন একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ঘোষণা করেছিল, অত্যাচারী কোন ইংরেজ শাসককে এই জেলায় বাঁচতে দেবে না এবং পরপর তিন জনকে মৃত্যুদণ্ডও দিয়েছিল। এই জেলাতেই ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যাকে রক্ষার লড়াইয়ে অসংখ্য নারীপুরুষ গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন, বহু মা-বোন ধর্ষিতা হয়েছিলেন। গ্রামের অশিক্ষিতা কৃষক রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা এই লড়াইতে মৃত্যুবরণ করে চট্টগ্রামের শহীদ প্রীতিলতার পরই ভারতের নারীসমাজের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।

মঞ্চে (ডানদিক থেকে) কমরেডস্ প্রতিভা মুখার্জী, রণজিৎ ধর, অনিল সেন, অসিত ভট্টাচার্য ও প্রভাস ঘোষ

আর এবার আপনারা সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকমাস ধরে বুকের রক্ত ঢেলে, জীবন বলি দিয়ে এক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের স্কীম 'সেজ'-এর গ্রাস থেকে চাষের জমি, বসতবাড়ি, বাগান-বাগিচা সব কিছু রক্ষা করে আর এক ইতিহাস রচনা করেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, বিপন্ন গরিব কৃষক-খেতমজুর, শ্রমিক-মধ্যবিত্তদের সামনে বাঁচার পথের সন্ধান দিয়েছেন। নন্দীগ্রাম আজ ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের তীর্থস্থান। নন্দীগ্রামের গৌরবময় সংগ্রামের কথা শুধু এ দেশেই নয়, বিদেশেও যে ছড়িয়ে গেছে, তা বোঝা যায়, সম্প্রতি ফরাসি দেশ থেকে টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধিরা যখন আমাদের দলের অফিসে আসেন আপনাদের লড়াইয়ের কথা জানতে। তাঁরা কোনও সূত্রে জেনেছেন যে, এস ইউ সি আই এই আন্দোলনের এক অন্যতম প্রধান শক্তি।

এই লড়াইয়ে যাঁরা নিহত ও আহত হয়েছেন, তাঁদের এবং তাঁদের পরিজনদের আমাদের দলের পক্ষ থেকে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যাঁরা এই লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামিল হয়েছেন তাঁদেরও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যে মা-বোনেরা ধর্ষিতা হয়েছেন, তাঁদেরও শ্রদ্ধা জানাই। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, যাঁরা ধর্ষিতা, তাঁদের মাথা নিচু করে থাকার কোন কারণ নেই। তাঁদেরকে কেউ অমর্যাদার চোখে দেখলে, সেটা হবে অন্যায়। তাঁরা বীরের মত পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারী পুলিশ ও সিপিএম ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। এই লড়াইয়ে বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। অনেকে আহত হয়েছেন, আবার বহু মা-বোনেরা পশুরও অধম পুলিশ-ক্রিমিনালদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছেন। এই বীর নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছে যাতে গ্লানিতে, নিজেদের কলঙ্কিত ভেবে এঁদের মাথা নিচু হয়ে যায়, মনোবল ভেঙ্গে যায় — যাতে শুধু এঁরাই নন, দেশের কোথাও যাতে মহিলারা আক্রমণের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের প্রতিবাদে গণআন্দোলনে সামিল না হন। ফলে তাঁরা যদি মাথা নীচু করেন, আপনারা যদি তাঁদের অসম্মানের চোখে দেখেন, তাহলে তো বর্বর রাজ্য সরকারের ফ্যাসিস্ট ষড়যন্ত্রকেই সাহায্য করা হবে। আপনারা কি তা হতে দেবেন? তাঁরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, অকলঙ্কিত বীর সংগ্রামী যোদ্ধা, যাঁরা মানুষের মত মানুষ তাঁদের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, আজ যদি বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, নজরুলরা বেঁচে থাকতেন, তাহলে পরম স্নেহে ও শ্রদ্ধায় এই ধর্ষিতা মা-বোনেদের কোলে টেনে নিয়ে তাঁদের চোখের জল মুছিয়ে দিতেন। আজ যদি কেউ এই মা-বোনেদের অসম্মানের চোখে দেখেন, তাহলে তাঁর এই বড় মানুষদের নাম উচ্চারণ করারও অধিকার থাকবে না। এই যুগের সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের মহান নেতা শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসেবে বলতে পারি, আমরা যদি এঁদের পিতা, স্বামী বা সন্তান হতে পারতাম, তাহলে গর্ববোধ করতাম।

আমার মনে পড়ে, ১৯৪৯ সালে মহান মাও সে তুঙের নেতৃত্বে চীনের মুক্তি সংগ্রাম জয়যুক্ত হবার পর আমার দাদাস্থানীয় একজন ১৯৫২ সালে চীনে গিয়েছিলেন। দেশের মুক্তি সংগ্রামের নির্দশন বহনকারী নানা ঐতিহাসিক স্থান তাঁদের দেখানো হয়। সবশেষে নিয়ে যাওয়া হয়, ওঁদের ভাষায় পবিত্র স্থানে, যেখানে খুবই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন পঞ্চাশোর্ধ বেশ কিছু মহিলা, যাঁরা মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে জাপানি সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক গণধর্ষিতা হয়েছিলেন। এভাবেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই মহিলাদের সমগ্র দেশের সামনে তুলে ধরেছিলেন। আর এখানে ভণ্ড কমিউনিস্টরা কি করেছে তা তো আপনারা জানেন। আপনাদের আরেকটি ঘটনা স্মরণ করাতে চাই। ব্রিটিশ যুগের একজন জেলের সুপার কয়েদীদের মুখ থেকে শোনা নানা জীবনকাহিনী নিয়ে 'লৌহকপাট' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। তাতে বদর মুন্সী নামে এক ডাকাতের চরিত্র আছে। এই ডাকাত এত দুর্ধর্ষ ছিল যে, সেই যুগে পূর্ব বাংলার বহু জেলা তার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল, ব্রিটিশ পুলিশও তাকে ধরতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিজেই চরম আত্মগ্লানিতে ধরা দিয়েছিল। এক বিয়ে বাড়িতে সে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। ডাকাতির কাজ শেষ করে ফেলেছে, ইতিমধ্যে পুলিশও ঘিরে ফেলেছে, সঙ্গীরা সব বেরিয়ে গেছে, সর্দারও নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু বেরোবার মুখে এক নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে ছুটে গেল, গিয়ে দেখে ফুলশয্যায় সদ্যবিবাহিত স্বামীকে খুন করে তার দলেরই এক ডাকাত মূর্ছিতপ্রায় কিশোরী নববধূকে ধর্ষণ করছে। বিদ্যুৎ বেগে সেই অপরাধীকে টেনে তুলে চরম শাস্তি দিয়ে নিজে অপরাধের গ্লানিতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পুলিশেরও ধরা দুঃসাধ্য যে ডাকাত সর্দার বদর মুন্সী, সে স্বেচ্ছায় ধরা দিল এবং কোর্টে দাঁড়িয়ে নিজেকেই অপরাধী ঘোষণা করে দণ্ড নিল। এই কাহিনী বলার একটি কারণ, সেটা হচ্ছে একজন ডাকাতেরও যে বিবেকদংশন ও অপরাধবোধ থাকে, আজকের দিনের এইসব অতি সুশিক্ষিত, সুমার্জিত, উচ্চাঙ্গের সাংস্কৃতিক আবরণে ভূষিত, নিত্য উপদেশদানে অভ্যস্ত শাসকদের তা নেই। এরা হাসপাতালে রেকর্ড করতে না দিয়ে এবং সকল প্রমাণ লোপাট করে নির্বিকারে বলতে পারে, 'ধর্ষণের কোন প্রমাণ নেই'। এরা বলতে পারে, '১৪ মার্চ যে ১৪ জন মারা গেছে, তার মধ্যে ৬ জনকে মেরেছে আন্দোলনকারীরাই', অর্থাৎ আন্দোলনকারীরাই আন্দোলনকারীদের খুন করেছে। এমন কথা যারা নির্দ্বিধায় বলতে পারে, তারা তো ক্রিমিনালদের থেকেও অধম।

আপনারা জানেন, নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের সমস্যার কথা বলে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছিল, সেই বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়েও আমরা যাইনি। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, শিল্পপতিদের উদ্যোগেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। নন্দীগ্রামের লড়াই পুঁজিপতি-সাম্রাজ্যবাদীদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে, বাইরেও বিভিন্ন দেশে এই শোষকশ্রেণী কৃষিজমি দখল করে কৃষক-শ্রমিকদের জবাই করে রক্ত চোষার কসাইখানা 'এস ই জেড' গড়তে যাচ্ছে। লর্ড কার্জন একদিন সদম্ভে ঘোষণা করেছিল, বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত সেটেল্‌ড্ ফ্যাক্ট, আর নড়চড় হবে না। ক্ষুদিরামরা লড়াই করে প্রাণ বলি দিয়ে সেই সিদ্ধান্তকে 'আনসেটেল্‌ড্', অর্থাৎ বাতিল করিয়েছিল। তেমনি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও উদ্ধত কণ্ঠে বলেছিলেন, নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব হবেই। আপনারা বীরের মত লড়াই করে মুখ্যমন্ত্রীকে মাথা নিচু করে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য করলেন। পুঁজিপতিরা আতঙ্কিত যে, নন্দীগ্রামের পথে অন্যত্রও কৃষকরা প্রতিরোধ করবে। তারা আরও আতঙ্কিত, প্রায় পাঁচ মাস হতে চলল, খুনি পুলিশকে নন্দীগ্রামবাসীরা ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। অথচ নন্দীগ্রামের ভেতরে আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন, একথা কেউ বলতে পারবে না। শুধু সমস্যা, বর্ডারে খেজুরি থেকে সিপিএমের প্রতিদিনের বোমা ও গুলিবর্ষণ। কিন্তু নন্দীগ্রামের ভেতরে পুলিশ নেই, অথচ চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপি কোন কিছু নেই। হাটবাজার-স্কুল-চাষবাস সব কিছুই মানুষ চালাচ্ছে। গণআন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও নৈতিক বল যে কত শক্তিশালী, তারই এটা এক নজিরবিহীন ঘটনা হয়ে গোটা দেশে এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এজন্যই শোষকশ্রেণী ও শাসকদের কাছে এটা বিপজ্জনক।

> আমি নিশ্চিত বলতে পারি, আজ যদি বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, নজরুলরা বেঁচে থাকতেন, তাহলে পরম স্নেহে ও শ্রদ্ধায় এই ধর্ষিতা মা-বোনেদের কোলে টেনে নিয়ে তাঁদের চোখের জল মুছিয়ে দিতেন। আজ যদি কেউ এই মা-বোনেদের অসম্মানের চোখে দেখেন, তাহলে তার এই বড় মানুষদের নাম উচ্চারণ করারও অধিকার থাকবে না। এই যুগের সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের মহান নেতা শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসেবে বলতে পারি, আমরা যদি এঁদের পিতা, স্বামী বা সন্তান হতে পারতাম, তাহলে গর্ববোধ করতাম।

তাই তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, যেভাবেই হোক, আন্দোলন থামাতে হবে। সেজন্যই সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন। কিন্তু আমরা যোগ দিই নি। আমরা বলেছি, নন্দীগ্রামের জনগণ লড়ছে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে। এই কমিটির প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে কোন আলোচনা হতে পারে না। আরও কিছু শর্ত আমরা দিয়েছিলাম, সেগুলি আমাদের দলের প্রচারিত হ্যাণ্ডবিলে এবং কিছু কিছু সংবাদমাধ্যমে আপনারা দেখেছেন। ফলে এখানে আর তা বলছি না। এই বৈঠকে কংগ্রেস, তৃণমূল সব ভোটের পার্টি গিয়েছিল — রাজনীতিতে যাদের একমাত্র লক্ষ্য ভোট ও গদীদখল। তার জন্য শিল্পপতিদের আশীর্বাদ ওদের প্রয়োজন, অর্থ সাহায্য প্রয়োজন। আপনারা জানেন, এস ইউ সি আই গরিব মানুষের দল, শিল্পপতিদের কাছে আমরা নিজেদের বিক্রি করিনি। জনগণ থেকেই হাত পেতে আমরা অর্থসংগ্রহ করি। তাই শিল্পপতিদের নির্দেশে ওরা বৈঠকে যেতে বাধ্য, কিন্তু আমাদের মত বিপ্লবী দলকে বাধ্য করার শক্তি কারুরই নেই। তাই আমরা নন্দীগ্রামবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বৈঠকে

পাঁচের পাতায় দেখুন

জনগণের সংগ্রামী ঐক্যের প্রতীক ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিকে রক্ষা করুন

চারের পাতার পর

যাইনি। তৃণমূল নেত্রী কি এই আশায় বৈঠকে গিয়েছিলেন যে, সিপিএম মেনে নেবে, নন্দীগ্রামে তারা গণহত্যা করেছিল? কোন সরকার বা দল একথা কি স্বীকার করে? তাকে স্বীকার করতে বাধ্য করতে হয় এবং সেটা একমাত্র সম্ভব গণআন্দোলনের শক্তিতে, যেমন আপনারা আন্দোলনের জোরেই সরকারকে কৃষিজমি দখলের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য করেছিলেন।

আপনারা শুনেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, নন্দীগ্রামে যখন আর জমি নেওয়া হচ্ছে না, তখন আর ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি রাখার দরকার নেই। এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। ওরা চাইছে, এই কমিটি ভেঙে যাক, তাহলে আর আপনাদের ঐক্য থাকবে না, আন্দোলন হবে না। ওরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে, ওদের কাজ হাসিল করবে। এই ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিকে আপনারা রক্ষা করে যাবেন। মনে রাখবেন, এই কমিটির ডাকেই এত লড়াই হয়েছে। এই কমিটির ডাকে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, বুকের রক্ত ঢেলেছেন। এই কমিটির ঐক্যকে কি ভাঙা যায়? আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও আপনারা কোন দলের নামে নয়, এই ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নামেই লড়বেন। আমাদের পার্টি তাতে প্রস্তুত। কোথাও প্রার্থী বাছাই নিয়ে বিভিন্ন দলে মতভেদ হলে সংগ্রামী সৎ নির্দল প্রার্থী দেবেন, কিন্তু কমিটির ঐক্য রক্ষা করবেন। আগামী দিনে আরও বহু সমস্যা, বহু আক্রমণ আসবে, তখন এই কমিটির নেতৃত্বেই লড়তে হবে।

আপনারা তো জানেন, ২০০৪ সালে যখন নন্দীগ্রামকে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অধীনে আনার ঘোষণা হয়, তখন থেকেই আমাদের দল এখানে লড়াই শুরু করে। ২০০৫ সালে যখন রাজ্য সরকার এখানে কেমিক্যাল হাব গড়ার সিদ্ধান্ত জানায়, তখন আমরাই প্রথম উদ্যোগ নিয়ে দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে আন্দোলন করার জন্য কমরেড নন্দ পাত্র, ভবানী দাস, আনসারদের উদ্যোগে একটি পাবলিক কমিটি গড়ে তুলি। এলাকায় এলাকায় বহু গণকমিটি ও ভলান্টিয়ারবাহিনী গঠিত হয়। এরপর তৃণমূল নেতৃত্বের নির্দেশে ওরা আরেকটা কমিটি ২০০৬ সালে গড়ে তোলে। ২০০৭ সালে জমিয়তে উলেমা হিন্দও আরেকটা কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়। তখন আমরা কলকাতা থেকে আমাদের দলের স্থানীয় সংগঠকদের বলি যে, আলাদা আলাদা কমিটি হলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সব কমিটিগুলিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন কর। এভাবেই ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি গড়ে ওঠে। তারপর থেকে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এই আন্দোলনে আমাদের দলের কর্মীরা প্রাণপাত পরিশ্রম করলেও, কোথাও দলের কোন ব্যানার, ঝাণ্ডা আমরা লাগাই নি, যা কিছু হয়েছে এই কমিটির নামেই হয়েছে। শুধু এতদিন বাদে দলের নামে আজকের এই মিটিং হচ্ছে। এই কমিটির ঐক্য আমরা রক্ষা করতে চাই, নিচুস্তরেও গণকমিটি থাকবে। কমিটির মধ্যে আমাদের দলের সাথে অন্য দলের মতপার্থক্য হলে পাবলিকের উপস্থিতিতে আলোচনা করে মীমাংসা করার পদ্ধতি আমরা চাই। প্রয়োজনে মেজরিটিতে সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু কোন দলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া, বা এই কমিটিকে এড়িয়ে সিপিএমের সাথে বোঝাপড়া এগুলি যেন না হয়। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির ঐক্য রক্ষা করা এবং এই কমিটি যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করে, এটা দেখা আপনাদের দায়িত্ব। কোন দল যদি ভুল করে, আমাদের দলও যদি ভুল করে, আপনারা সমালোচনা করবেন। কাউকে অন্ধের মত মানবেন না।

দেখতে হবে, কোন্ দল কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনে বা জনগণের বাঁচার আন্দোলনে সত্যিই সিরিয়াস, আবার কোন্ দল জনগণের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ভোটের জমি তৈরি করছে। কোন্ দল পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে জনগণের মূল শত্রু বলে চিনিয়ে দিচ্ছে, আর কোন্ দল পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল করে আগামী ভোটের দিকে তাকিয়ে শুধু সরকারি দলের বিরুদ্ধেই বিক্ষোভকে চালিত করছে। দেখতে হবে, কোন দল আন্তরিকভাবে চাইছে, জনগণ রাজনৈতিক সচেতন হয়ে নিচুতলায় গণকমিটি গঠন ও ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে সাহস ও উন্নত চরিত্রের জোরে আন্দোলন চালাক, পুলিশ ও ক্রিমিনালদের আক্রমণ প্রতিরোধ করুক; আর কোন্ দল চায় জনগণকে অসচেতন ও অসংগঠিত রেখে উপর থেকে নেতানেত্রীদের নির্দেশে আন্দোলনের নামে কিছু বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ হোক, যাতে দাবি আদায় হোক আর না হোক, আগামী ভোটে ফয়দা তোলা যায়। আর চায়, যেন জনগণ মাথা না খাটায়। নেতাদের বক্তব্য, কর্মসূচি বিচার না করে নেতা-নেত্রীর গরম গরম ভাষণ শুনবেন, আর শুধু হাততালি দেবেন, যেমন বলবে তেমনি চলবেন। আন্দোলনের নামে এতদিন আমাদের দেশে এ সবই হয়েছে। ফলে আপনারা সতর্ক থাকবেন।

আপনাদের আর একটি কথা বলতে চাই। আপনারা অনেকেই আগে বামপন্থী মনে করে সিপিএমকে সমর্থন করতেন। আজ সেই সিপিএম সরকারের এই চেহারা দেখে মার্কসবাদ ও বামপন্থাকে ভুল বুঝবেন না। আপনারা জানেন, অনেক দেখে ও ঠেকে শিখে একদিন 'গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় না', 'মক্কা গেলেই হাজি হয় না', 'খদ্দর পরলেই স্বদেশী হয় না' — এই প্রবচনগুলি চালু হয়েছিল। কেন হয়েছিল? অতীতে মানবকল্যাণে ব্রতী গেরুয়া বসনধারীদের সততা দেখে মানুষ শ্রদ্ধা করত, এটা দেখে ভণ্ডরাও গেরুয়া বসন পরতে শুরু করেছিল। অনেক কষ্ট করে মক্কায় হজ করা হাজিদের চরিত্র দেখেও মানুষ ভক্তি করত, তাই দেখে ধুরন্ধর লোকেরাও মক্কায় গিয়ে বা মাঝপথ পর্যন্ত গিয়ে হাজি সাজত। খদ্দর পরা স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের দেশপ্রেম ও চরিত্র দেখে মানুষ তাঁদের মানত, এসব দেখে একদল ধান্ধাবাজরাও খদ্দর পরা শুরু করেছিল। এসব কারণেই লোকজনকে সতর্ক করার জন্যই ঐ কথাগুলো এসেছিল। তেমনি রাশিয়ার মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, চীনের মুক্তি সংগ্রাম, ভিয়েতনামের স্বাধীনতার লড়াই, এসব দেখে দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে মার্কসবাদ, কমিউনিজম ও লালঝাণ্ডার প্রতি প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। এসব দেখে অনেক ধুরন্ধর মতলববাজও 'মার্কসবাদ জিন্দাবাদ', 'কমিউনিজম জিন্দাবাদ', 'লাল ঝাণ্ডা কি জয়', এইসব শুরু করেছিল। তাই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহান নেতা লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ, শিবদাস ঘোষ বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, মার্কসবাদের আলখাল্লা, আর হাতে লাল ঝাণ্ডা দেখলেই বিশ্বাস করবেন না। বিচার করবেন, তারা খাঁটি না মেকি। সিপিএম, সিপিআই — এরা হচ্ছে এই মেকি কমিউনিস্ট দল। না ধরতে পেরে এতদিন বিশ্বাস করে আপনারা ঠকেছেন।

ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিকে আপনারা রক্ষা করে যাবেন। মনে রাখবেন, এই কমিটির ডাকেই এত লড়াই হয়েছে। এই কমিটির ডাকে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, বুকের রক্ত ঢেলেছেন। এই কমিটির ঐক্যকে কি ভাঙা যায়? আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও আপনারা কোন দলের নামে নয়, এই ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নামেই লড়বেন। আমাদের পার্টি তাতে প্রস্তুত। কোথাও প্রার্থী বাছাই নিয়ে বিভিন্ন দলে মতভেদ হলে সংগ্রামী সৎ নির্দল প্রার্থী দেবেন, কিন্তু কমিটির ঐক্য রক্ষা করবেন। আগামী দিনে আরও বহু সমস্যা, বহু আক্রমণ আসবে, তখন এই কমিটির নেতৃত্বেই লড়তে হবে।

আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, এদেশের স্বদেশী আন্দোলনের মহান বিপ্লবী যোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবিস্মরণীয় উক্তি। তিনি নিজে ছিলেন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, কিন্তু গভীর শ্রদ্ধায় বলেছিলেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর জার্মানির শ্রেষ্ঠ অবদান মার্কসবাদ, আর বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ অবদান সমাজতন্ত্র, সর্বহারা রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি। অথচ সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন আপোষমুখী বুর্জোয়া দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া নেতৃত্ব বামপন্থী বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে ষড়যন্ত্র করে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করল, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করে বহিষ্কার করল, তখন সুভাষচন্দ্র খুবই আশা করেছিলেন, বামপন্থী হিসাবে অবিভক্ত সিপিআই তাঁর পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু তারা দক্ষিণপন্থীদেরই সাহায্য করল। নেতাজী যখন রামগড়ে সকল বামপন্থীদের একত্র করে ফ্রন্ট করতে উদ্যোগ নিলেন, তখন সিপিআই দূরে সরে রইল। নেতাজীর আই এন এ বাহিনী তৈরি করে স্বাধীনতার জন্য লড়াইকে সিপিআই জাপানের দালালি বলেও কুৎসা রটিয়েছিল। সেই সময়ের সিপিআইতে কিন্তু সিপিএমের নেতারাও ছিলেন। এত সত্ত্বেও কিন্তু নেতাজী বলেছিলেন, 'বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য বেগে এগিয়ে চলেছে কমিউনিজমের ধারা। যুদ্ধে পরাজয়ের মুখেও বলেছিলেন, 'আগামী দিনে সমগ্র বিশ্বের ভরসা জোসেফ স্ট্যালিন। নেতাজী যদি এই ভণ্ড কমিউনিস্টদের আচরণ দেখে মার্কসবাদের উপর আস্থা না হারান, আপনারা তাহলে এদেরকে দেখে সেই আস্থা হারাবেন কেন? ভুলে যাবেন না, সেই যুগের বড়মানুষ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলরা, শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং সহ অন্য বিপ্লবীরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের জীবনে, সমগ্র দেশের জীবনে যা কিছু দুঃখদুর্দশা, যা কিছু অত্যাচার-আক্রমণ হচ্ছে তার জন্য দায়ী পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ। যতদিন এই পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থাকে উচ্ছেদ না করা যাচ্ছে ততদিন এসব বাড়তেই থাকবে শুধু নয়, আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। এর থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আর এই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য চাই মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। আমাদের দল এস ইউ সি আই এই বিপ্লবী আদর্শের শক্তিতেই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে লড়ছে। আপনারা জানেন, আমরা একটি সংগ্রামী বামপন্থী দল হয়েও 'বামফ্রন্টে' নেই। ২০০১ সালের ভোটে সিপিএম একত্রে লড়বার জন্য আমাদের ডেকেছিল, তবুও আমরা যাইনি। গেলে নিশ্চয়ই আমরা অনেক এম এল এ, মন্ত্রীত্ব পেতাম, কিন্তু যাইনি। কারণ ওরা বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস, বিজেপি'র মতই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের গোলামি করছে। ২০০৬ সালের ভোটে তৃণমূল আমাদের সাথে বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল, আমরা যাই নি। কারণ এরাও বুর্জোয়া দল, গদিসর্বস্বতাই এদেরও রাজনীতি। এরাজ্যে কংগ্রেস শাসনের সময়েও এস ইউ সি আই বিপ্লবী ঝাণ্ডা নিয়ে বহু লড়াই করেছে; আবার

ছয়ের পাতায় দেখুন

আত্মহত্যা নয়, বাঁচতে হবে প্রতিরোধ সংগ্রামের পথে

তিনের পাতার পর

আত্মঘাতী হলেন বর্ধমান জেলার মেমারি ব্লকের সেখ সোরাবউদ্দিন। এ প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ 'স্থানীয় প্রতিবেশীদের বক্তব্য, আলুচাষীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের ঘোষণার পর বর্ধমানের জেলাশাসক, সভাধিপতি এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন। ক্ষতিপূরণ নিয়ে তাঁরা একটি রিপোর্টও জমা দেন। কিন্তু তারপর বিষয়টি নিয়ে সরকারি তরফে কোনও উচ্চবাচ্য না হওয়ায় সোরাব মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। গ্রামবাসীরা বলেন, সোরাবের মত আরও অনেক চাষীই রয়েছেন গ্রামে। এঁরা প্রত্যেকেই আলুচাষ করে এখন ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বসে রয়েছেন। সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগী না হলে মানসিক অবসাদ থেকে আরও অনেক চাষীই আত্মহত্যা করবেন' (একদিন, ৬ জুন ২০০৭)।

কৃষিপ্রধান গ্রাম-বাংলার কৃষকদের আজ এমনই দুর্দশা। আত্মঘাতী কৃষকদের সবার ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয় না। আবার, যাঁদের সংবাদ প্রকাশ পায় তাও ভিতরের পাতার কোন এক অখ্যাত অংশে; পাঠকদের নজরে সহজে পড়ে না। তা থেকেই সংগ্রহ করা কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল মাত্র। আত্মহত্যা এরাজ্যে ক্রমাগত বাড়ছে। ২০০৫ সালে আত্মহত্যায় পশ্চিমবঙ্গ দেশে শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। গ্রামীণ মানুষ যে বিপুল সংখ্যায় আত্মহত্যা করছে তার কতটা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে ঋণের চাপজনিত মানসিক অবসাদে — কে তার হিসাব রাখে!

কৃষক মরছে, আত্মহত্যা করছে। তাদের বাঁচাতে সরকার এগিয়ে আসছে না। লোক দেখানো সমীক্ষা, বিবৃতি দান, ঘোষণা এবং তদন্ত করেই দায়িত্ব শেষ করছে; আবার 'কৃষি আমাদের ভিত্তি' এবং 'কৃষিতে আমরা প্রথম' ইত্যাদি তারস্বরে প্রচার করে সরকার নিজেদের উদাসীনতা ও অপদার্থতাকে আড়াল করতে চাইছে। তারা কৃষকদের রক্ষার কোন উদ্যোগ না নিয়ে, বরং কৃষিকে নিজেরাই অলাভজনক করে তুলে অন্যান্য রাজ্যের দক্ষিণপন্থী সরকারগুলির মতই কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের এনে ঢোকাচ্ছে, তাদের কৃষিক্ষেত্র লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকার ও বৃহৎ সরকারি দল অহরহ চাষীদের মধ্যে প্রচার করে চলেছে যে, কৃষি অলাভজনক; ফলে কৃষিজমি কিছু টাকার বিনিময়ে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়াটা নাকি লাভজনক। তারা পুঁজিপতিদের সঙ্গে চুক্তিচাষেও কৃষকদের উৎসাহ দিচ্ছে।

কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম — সব সরকারই কৃষক স্বার্থ বিরোধী

এই ঘটনা গোটা দেশজুড়ে ঘটছে নানাভাবে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে নানা রঙের নানা দলের যে সরকারই থাক, মূল নীতিতে তাদের কোন বিরোধ নেই। কোনও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিই সাধারণ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করছে না। কংগ্রেস, বিজেপি সরকারই হোক, আর সিপিএম সরকারই হোক, প্রতিটি সরকারেরই নীতি কৃষিপণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করা। কৃষিপণ্যের আমদানি এবং রপ্তানির নীতিও তাদের মুনাফার দিকে লক্ষ রেখেই। পশ্চিমবাংলায় সাধারণ আলুচাষীরা যখন বাজারে দাম না পেয়ে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে, আত্মহত্যা করছে, তখন আলুর বৃহৎ ব্যবসায়ীরা মুনাফা লুটছে। পুঁজিপতি ও বৃহৎ ব্যবসাদারদের মুনাফা রক্ষা ও তা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ রেখেই সরকার বিশ্বায়ন, উদারীকরণের নামে কৃষি থেকে সমস্ত ভরতুকি তুলে নিচ্ছে; সার-বীজ-কীটনাশক প্রভৃতি কৃষি-উপকরণগুলির বাজার দেশি-বিদেশি ও বহুজাতিক পুঁজির মালিকদের বিপুল মুনাফা লুটবার জন্য খুলে দিচ্ছে। ডব্লিউ টি ও এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সুপারিশ মত জমির ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিয়ে বৃহৎ পুঁজিকে তারা কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছে। রপ্তানিমুখী অর্থকরী ফসল চাষে চাষীদের উৎসাহ দিচ্ছে। আর, সরকারের এই পরামর্শ মেনে অর্থকরী ফসল তুলা, আঙুর ইত্যাদি চাষ করে কৃষকদের সর্বনাশ হচ্ছে।

ন্যাশনাল কমিশন ফর ফারমার্স-এর সদস্য আর এল পিতালে মন্তব্য করেছেন, ''ভারতীয় কৃষক সর্বদাই ঋণের জালে। কিন্তু এটা সহ্যসীমার মধ্যে ছিল। এখন, পরিস্থিতিকে ধ্বংসের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে পুঁজিনিবিড় ফার্মিং — বহুজাতিক কোম্পানির বীজ, সার এবং কীটনাশক — এবং বারংবার শস্যহানি, ঋণ ইত্যাদি'' (সানডে টাইমস্, ৮ অক্টোবর, ২০০৬)। অন্যদিকে সরকার ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদের কার্যকর সাহায্যে তেমন এগিয়ে আসছে না। মহারাষ্ট্র সরকারের নিজস্ব ওয়েবসাইট স্বীকার করেছে মাত্র ২৫ শতাংশ চাষী ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায়, বাকি ৭৫ শতাংশ চাষীকেই মহাজনদের থেকে ৪৮-৬০ শতাংশ হারে চড়া সুদে ঋণ করতে হয়। এবং সেই সুদ আদায়ে মহাজনরা চরম অমানবিক পন্থা অবলম্বন করে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক ও মানসিক — উভয় দিক থেকে ভেঙে পড়া কৃষকদের বাঁচাতে একটা আবেগময় ভরসাস্থল প্রয়োজন হয়। কিন্তু আজ আর কেউ তাদের পাশে দাঁড়াবার নেই (সূত্র ঃ ঐ)।

বন্দনা সিন্ধে-রা বাঁচবে কী করে

বিদর্ভের এক আত্মঘাতী কৃষকের বিধবাপত্নী বন্দনা সিন্ধের কণ্ঠে যখন শুনি, 'আমার স্বামী ভুল করেছে, কিন্তু আমি বাঁচবো, আমার সন্তানদের পড়াশুনো করাতে আমি কঠিন পরিশ্রম করবো' (সানডে টাইমস্ ৮ অক্টোবর ২০০৬), তখন প্রশ্ন ওঠে — এঁরা কী করে বাঁচবেন? কোথায় সেই বাঁচার পথ? কাকে ভরসা করে এঁরা বাঁচবেন? প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার তো বৃহৎ ব্যবসায়ীদের জন্য লুঠের বাজার খুলে দিয়ে সাধারণ চাষীদের জন্য চোখের জল ফেলার নাটক করছেন এবং দয়া করে কিছু সাহায্যদানের ঘোষণা শোনাচ্ছেন। তাঁদের সহযোগী সিপিএম মুখে কেন্দ্রের সমালোচনা করে এবং রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস, বিজেপি সরকারগুলির সমালোচনা করে নিজেরাই এ রাজ্যে একই কৃষক স্বার্থ-বিরোধী ভূমিকা নিচ্ছে — কৃষির বৃহৎ ব্যবসাদার, ফড়ে-দালালদের স্বার্থরক্ষা করছে। তাই এখানেও কৃষককে আত্মহত্যা করে ঋণজাল থেকে অব্যাহতি পাওয়ার রাস্তা খুঁজতে হচ্ছে। তাহলে?

কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম সহ রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলি পুঁজিবাদের ও পুঁজিপতিশ্রেণীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থ কে কত বিশ্বস্ততার সঙ্গে রক্ষা করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতায় এরা মত্ত। সাধারণ মানুষের আজ প্রশ্ন — সমাজে যারা দুর্বলশ্রেণী — সেই চাষী-মজুর-সাধারণ মানুষকে শোষণ-লুণ্ঠন-উৎপীড়নের থেকে রক্ষার লক্ষ্যে সরকার যদি কাজ না করে, তারা যদি লুঠেরা পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থরক্ষার জন্যই সদাব্যস্ত থাকে, তবে সাধারণ মানুষের কাছে এইসব সরকারের প্রয়োজন কোথায়? ফসল যদি মাঠে নষ্ট হয়ে যায়, চাষী যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে, আকণ্ঠ ঋণে যদি ডুবতে থাকে, তবে সরকার কেন এসে দাঁড়াবে না চাষীর পাশে? কেন তাদের রক্ষা করবে না আত্মহত্যার কবল থেকে? কেন আত্মঘাতী কৃষকদের পরিবারগুলিকে বাঁচানোর ব্যবস্থা সরকার করবে না?

আত্মহত্যা নয়, বাঁচতে হবে প্রতিরোধ সংগ্রামের পথে

দেশের কৃষক সমাজ আজ চরম হতাশার শিকার। মনে রাখতে হবে, এর সুরাহার পথ আত্মহত্যা নয়। এর সুরাহা আছে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামের আড়ালে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকার সমস্ত দিক থেকে পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবাদাস, তারা কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থরক্ষাকারী নয়। এই সেবাদাস হওয়ার লক্ষ্যেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ক্ষমতালোভী রঙ-বেরঙের রাজনৈতিক দলগুলো। এদের করুণার ওপর নির্ভর করা নয়, কিংবা অভিমানে আত্মহত্যা করে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়াও নয়, নিজেদের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন, যে আন্দোলন বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদের পরিপূরক হবে। এটাই বাঁচার রাস্তা। এদেশকে সন্তান-সন্ততিদের যথার্থ বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার এটাই একমাত্র উপায়।

নন্দীগ্রামে জনসভা

পাঁচের পাতার পর

সিপিএম গদিতে বসার পরও সম্পূর্ণ এককভাবে জনগণের দাবি নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ লড়াই করে যাচ্ছে। প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তন, হাসপাতালের চার্জ ও বিদ্যুতের দাম কমানো, ছাত্রদের ফি কমানো সহ বহু দাবি আন্দোলন করেই আদায় করেছে। ক্ষিপ্ত হয়ে সিপিএম এ পর্যন্ত আমাদের দলের ১৫১ জন নেতা-কর্মীকে খুন করেছে। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে ২৪ জন নেতা-কর্মীকে যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ করিয়েছে। আরও ১০৮ জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মার্ডার কেসের মামলা করিয়েছে। কিন্তু এত করেও আমাদের দলকে দমাতে পারেনি। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত আমাদের দলের কর্মীরা সকল শোষণ-অত্যাচার-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে, বুকের রক্ত ঢেলে দেশের সর্বত্র লড়ে যাচ্ছে। তিনি আমাদের বলতেন, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হলে প্রথমে রক্ত দিতে হবে, প্রাণ দিতে হবে। তিনি বলতেন, উন্নত চরিত্র চাই, চাই সাহস, তেজ, জনগণের প্রতি দরদবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠা। আমাদের বারবার বলে গেছেন, সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের জন্য আগে এ দেশের নবজাগরণের ও স্বদেশী বিপ্লববাদের যুগের বড় মানুষদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নাও। তাই আমাদের দলের কর্মীরা এত নিষ্ঠায় মনীষী ও বিপ্লবীদের স্মরণ দিবসগুলি উদ্‌যাপন করে।

আপনারা তো স্বচক্ষে দেখেছেন, এই নন্দীগ্রামে আমাদের দলের কর্মীরা কীভাবে লড়ছে। অথচ আপনারা কি এই দলের খবর কাগজে, টিভি-রেডিওতে বিশেষ পাচ্ছেন? আজকে এত হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ হচ্ছে, কাল এর খবর কোথাও কি পাবেন? পাবেন না। যেমন ৯ মার্চ আপনাদের দাবিতে কলকাতায় যে লক্ষাধিক লোকের মহামিছিল করেছি, সেই খবর আপনারা কাগজে, টিভিতে পাননি। কারণ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এস ইউ সি আইকে দুশমনের মত ভয় পায়। এই দলের হাতেই ওদের মৃত্যুবান! তাই মালিকশ্রেণী নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমে এই দলের কোন খবর বিশেষ থাকে না, পাছে দলের প্রতি জনগণের আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়। ঠিক এরকমই হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ক্ষুদিরাম-নেতাজী-সূর্য সেন-ভগৎ সিংদের ক্ষেত্রে। আতঙ্কিত হয়ে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় পুঁজিবাদ এই বিপ্লবীদের খবর কাগজে প্রকাশ করতে দিত না, আর দক্ষিণপন্থী আপসমুখী নেতাদের ফলাও প্রচার দিত। আজও একই ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলে গেছেন, দেখতে অনেক দল, ঝান্ডা অনেক, কিন্তু রাজনীতি দু'টি — একটি হচ্ছে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার বিপ্লবী রাজনীতি, আরেকটি হচ্ছে পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে ভোটে গদি দখলের রাজনীতি। আপনাদের চিনে নিতে হবে, কোন্‌টা কোন্ ধরনের রাজনীতি। তার জন্য চাই রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীন বিচার শক্তি। কাগজে, টিভিতে প্রচার দেখে এবং এম এল এ, এম পি'র সংখ্যা দেখে অন্ধের মতো কোন দলের পিছনে ছুটবেন না। এই আপনাদের কাছে আবেদন। আর আবেদন ঐক্য রক্ষা করে চলবেন, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের হাতিয়ার ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিকে রক্ষা করবেন। এই কমিটির নেতৃত্বে পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য গণকমিটি ও ভলান্টিয়ারবাহিনী গড়ে তুলবেন। আগামী দিনেও এভাবেই বীরের মত শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবেন। আমাদের দল এস ইউ সি আইয়ের পক্ষ থেকে আবারও নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক সংগ্রামের যোদ্ধাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

চা-বাগানে মৃত্যু

একের পাতার পর

নিতে বলেছিলেন। তার কী ব্যবস্থা রাজ্য সরকার নিয়েছে? জরুরি ভিত্তিতে খাদ্যশস্য বিতরণ কি শুরু করেছে? যদি করত তাহলে এতগুলি মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটতো কি ? ফলে, এই মৃত্যুর জন্য বাগান মালিকরা এবং মালিকদের স্বার্থবাহী সরকারের শ্রমিকদের প্রতি চরম অবহেলাই যে দায়ী — তা কোন কিছু দিয়ে কি আড়াল করা যায়? একটা সরকার কি জনগণকে অনাহার থেকে রক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে? যদি করে তাহলে সে সরকারকে জনগণের কী প্রয়োজন? শ্রমিকদেরও আজ বুঝতে হবে, কপালের দোহাই দিয়ে অনাহারে মৃত্যুকে মেনে নেওয়া নয়, সংগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারকে বাধ্য করতে হবে দাবি মানতে।

টাটার কারখানায় ছাঁটাই ও আত্মহত্যা

একের পাতার পর

কর্মচারী পরমজিৎ সিং-এর (পাপ্পু) আত্মহত্যার ঘটনা অনেকের চোখ খুলতে সাহায্য করবে। পরমজিৎ আত্মহত্যা করার আগে সুইসাইডাল নোটে লিখেছে যে, বেকারি ও গরিবির জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করছে। সম্প্রতি তার মতো আরও তিন হাজার কর্মচারীকে টাটা মোটরস্ কর্তৃপক্ষ বসিয়ে দিয়েছে। কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে, প্রবল আর্থিক মন্দা। দু'মাস আগেও যেখানে ৪৫০-৫০০ গাড়ি প্রতিদিন তৈরি হত, এখন সেখানে ২০০-রও কম গাড়ি তৈরি হচ্ছে। বিগত ১০ বছরে কর্তৃপক্ষ কারখানার দুই-তৃতীয়াংশ লোককে ছাঁটাই করেছে। এখন আরও ৩০০০ জনকে বেকারির অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হল। শুনতে আশ্চর্যজনক হলেও এটা সত্য যে, টাটা মোটরস্-এ চার ধরনের কর্মচারী রয়েছে ঃ (১) স্থায়ী কর্মচারী, (২) বাই সিক্স (অস্থায়ী কর্মচারী), (৩) টি এম এস টি (টাটা মোটরস্ স্টিল ট্রেনি), (৪) শিক্ষানবিশ। এর মধ্যে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ২০ শতাংশ। অস্থায়ী কর্মীদের (বাই সিক্স) যখন তখন বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে (পরমজিৎ বাই সিক্স কর্মী ছিলেন)। টি এম এস টি এবং শিক্ষানবিশদের দিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ট্রেনিং না দিয়ে সরাসরি উৎপাদনের কাজ মাত্র ২৪০০ টাকা স্টাইপেন্ড দিয়ে করানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পরমজিতের মতো আরো বহু ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে মনে করছে টাটা মোটরস্-এর ছাঁটাই হওয়া কর্মচারীরা। এই টাটাই নাকি পশ্চিমবঙ্গে বেকারদের জন্য হাজার হাজার চাকরির সুযোগ করে দেবে!

‘শান্তি’ সম্পর্কে সকলের ধারণা এক নয়

একের পাতার পর

পুঁজিপতি শ্রেণী এবং সিপিএম-তৃণমূল নেতৃত্বের ধারণা কি এক হতে পারে? সিঙ্গুরের কৃষকদের দাবি, টাটার কারখানা অন্যত্র সরিয়ে তাদের কেড়ে নেওয়া কৃষিজমি ফেরত দিতে হবে এবং সেখানে হত্যা ও ধর্ষণে অভিযুক্তদের শাস্তি দিতে হবে, না হলে ওখানে শান্তি আসতে পারে না। নন্দীগ্রামের যে জনগণ বহু প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে সরকারকে নতি স্বীকার করিয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষিজমি দখলের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য করেছে, তাদেরও দাবি হচ্ছে, ১) গণহত্যা ও গণধর্ষণে অভিযুক্ত ক্রিমিনালদের গ্রেপ্তার করতে হবে, যে পুলিশ কর্তাদের নির্দেশে ও মদতে এটা ঘটেছে তাদেরও কঠোর শাস্তি দিতে হবে, ২) খেজুরি থেকে বোমা ও গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে হবে, ৩) নিহত-আহতদের পরিজনদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ৪) ‘ঘরছাড়া’দের ফেরানোর নামে খুনি-ধর্ষণকারীদের এলাকায় ঢুকতে দেওয়া চলবে না, ৫) আন্দোলনকারীদের উপর আনীত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। এই দাবিগুলি পূরণ না হলে নন্দীগ্রামেও যথার্থ শান্তি আসতে পারে না।

অন্যদিকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে ‘শান্তি’ হচ্ছে, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে, মুনাফা লুণ্ঠনের স্বার্থে গরিব চাষী-খেতমজুরদের অবাধে উৎখাত করিয়ে কৃষিজমির দখল নেওয়া। তারা চায়, এ ব্যাপারে কোনও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ যাতে না হয়। আর কিছু বিক্ষোভ যদি দেখা দেয়ও, তাদের বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল এরকম যারা যেখানে অপজিশনে আছে, তারা যেন সেই বিক্ষোভের নেতৃত্বে থাকে, যাতে বিপ্লবী দল আন্দোলনের নেতৃত্বে না আসতে পারে এবং আন্দোলন বেশিদূর না গড়ায় ও স্থায়ী না হয়। বিক্ষোভ যেন শুধুমাত্র গরম গরম বিবৃতি, মিছিল-মিটিং, পদযাত্রা, অবস্থান, অনশন এই সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জনগণের মারমুখী প্রতিরোধ সংগ্রাম তাদের কাছে আতঙ্কজনক। কারণ নন্দীগ্রামের মানুষ বীরের মত লড়ে সেজ করার স্কিম রুখে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ৩রা জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ মাস খুনি পুলিশকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে না দিয়ে নিজেরাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছে একটা ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের শক্তি ও নৈতিক বল কত শক্তিশালী। গণআন্দোলনের ইতিহাসে এদেশে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা, যেটা সমগ্র দেশের কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সকলকেই সংগ্রামে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করছে। এই ঘটনা পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের আরও আতঙ্কিত করে তুলেছে। কারণ, নন্দীগ্রামের অনুসরণে সারা দেশেই লড়াইয়ের আগুন জ্বলবে। ফলে তারা চায়, যেভাবেই হোক এই সংগ্রাম থামাতে হবে। না হলে তাদের ঘুম নেই, শান্তি নেই।

সিপিএম নেতৃত্বের আকাঙ্খিত ‘শান্তি’ হচ্ছে - ১) ক্রমাগত বৈঠক চালিয়ে, বিচারাধীন আছে অজুহাত তুলে এবং প্রশাসনিক তদন্তের দোহাই দিয়ে কালহরণ করে আজকের জাগ্রত জনমত ও গণবিক্ষোভ স্তিমিত করে দিয়ে অপরাধীদের বাঁচানো, ২) হিটলারের সাগরেদ গোয়েবলসের কায়দায় একটানা মিথ্যা প্রচার চালিয়ে আন্দোলনকারীদেরই দোষী খাড়া করে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত, খুন-ধর্ষণে অভিযুক্ত ও নিহত-আহত-ধর্ষিতাদের সমান স্তরে দাঁড় করানো, ৩) নন্দীগ্রামে পুলিশ ঢুকিয়ে আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়ে ও ‘ঘরছাড়া’ খুনি-ধর্ষণকারীদের প্রবেশ করিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে হারানো ‘রাজত্ব’ পুনরুদ্ধার করা এবং সম্ভব হলে সালিমের হাতে জমি তুলে দেওয়া, ৪) দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে সর্বাপেক্ষা ‘যোগ্য শাসকের’ আস্থা অক্ষুন্ন রেখে মন্ত্রীত্বের গদি আরও স্থায়ী করা, ৫) ‘শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী’ হিসাবে নিজেদের ইমেজ খাড়া করা। এসব করতে পারলেই সিপিএম নেতৃত্বের ‘শান্তি’ অর্জন হবে। এজন্যই তৃণমূল নেত্রীকে কিছু দিয়ে তারা কাজ হাসিল করতে চায়।

আর তৃণমূলের ‘শান্তি’ হচ্ছে, ১) জনগণের বিক্ষোভগুলিকে বিপ্লবী নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ স্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রামে সংগঠিত হতে না দিয়ে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কিছু প্রোগ্রামেই আটকে দেওয়া এবং বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের ব্যাকিংয়ে সেই বিক্ষোভগুলিকে পুঁজি করে নিজেদের ইমেজ খাড়া করে আগামী পঞ্চায়েত ও পরবর্তী ভোটগুলিতে ফয়দা তোলা, ২) বিক্ষোভগুলি যাতে সরকারি দল সিপিএমের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং কোনমতেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয়, এটা গার্ড করা—যেমন কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম যে যেখানে অপজিশনে আছে সেখানে একইভাবে একাজ করে যাচ্ছে। ৩) সিঙ্গুরে গণপ্রতিরোধ যখন নন্দীগ্রামের মতই তীব্র রূপ নিচ্ছিল, যখন শত শত পুরুষ-মহিলা জমি রক্ষার জন্য মাঠে নেমে পুলিশের সাথে লড়ছিলেন, যখন প্রয়োজন ছিল, জয় অর্জনের জন্য এই লড়াই শুধু কয়েকটি মৌজার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সমগ্র সিঙ্গুর থানার জনগণকে এই লড়াইয়ে প্রত্যক্ষভাবে সামিল করানো এবং আরও তীব্রভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, তখন তৃণমূল নেত্রী আচমকা কলকাতায় অনশনে নেমে ওখানকার প্রতিরোধ সংগ্রামের আগুনে বরফ জল ঢেলে দিলেন, যেন অনশনের দ্বারাই সব হয়ে যাবে, ওখানে আর লড়াইয়ের দরকার নেই, যার সুযোগ নিয়ে পুলিশ বাহিনী সকল জমি দখল করে নিল। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, লড়াইয়ে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামকে পথ দেখিয়েও জিততে পারলো না, অথচ নন্দীগ্রাম পেরেছে। সিঙ্গুরে তৃণমূলের এম এল এ এবং তাদের বেশ কিছু পঞ্চায়েত থাকা সত্ত্বেও এটা ঘটলো কেন? এই প্রশ্নের কী উত্তর তৃণমূল দেবে? এখন তৃণমূল চাইছে, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলে, যাঁরা চেক নেননি, তাঁদের জন্য কিছু জমির বন্দোবস্ত করে দিয়ে কোনক্রমে মুখ রক্ষা করতে। সিঙ্গুরের যে জনগণ জমি পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, এটা করতে পারলে দেখানো যাবে, তাদের জন্য নেত্রী অন্তত কিছু তো আদায় করে দিয়েছেন, তাই বৈঠকে এসে এটা সুনিশ্চিত করা। ৪) পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে তৃণমূল ‘রেসপনসিবল অপজিশন’ (দায়িত্বশীল বিরোধী), এই আস্থাও যেন অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। এটাই তৃণমূল নেতৃত্বের প্রত্যাশিত ‘শান্তি প্রতিষ্ঠা’।

শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উপরোক্ত বিচারের মাপকাঠিতে জনগণ বিচার করে দেখবেন, ভেবে দেখবেন, রক্তস্নাত নন্দীগ্রামের সন্তান-স্বামী-পিতা-মাতাহারা শোকার্ত যে মানুষগুলো চোখের জল ফেলতে ফেলতে আপনাদের বিবেকের দরবারে ন্যায্য বিচারের আকুল আবেদন জানাচ্ছেন, তাঁরা এই বৈঠক থেকে কী পাচ্ছেন? কী পাচ্ছেন অত্যাচারিত, কৃষিজমিচ্যুত সিঙ্গুরের জনগণ, যাঁরা সকলেরই জমি ফেরত পাওয়ার দাবিতে লড়ে যাচ্ছেন? এই জমি তো ন্যায়সঙ্গত লড়াইয়ের পথেই পাওয়া সম্ভব ছিল, যেমন নন্দীগ্রাম পেয়েছে। আজ যা পাওয়া যায় তাই লাভ, এমন ভাবার তো প্রয়োজন ছিল না।

জনগণের জানা দরকার, সিঙ্গুরে ও নন্দীগ্রামে আন্দোলনের নেতৃত্বে আছে যথাক্রমে সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি ও ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। সিঙ্গুর কমিটির দু’জন কনভেনরের একজন এস ইউ সি আইয়ের, অন্যজন তৃণমূলের। নন্দীগ্রামের কমিটির পাঁচ-জনের মধ্যে চারজন কনভেনর হচ্ছেন যথাক্রমে এস ইউ সি আইয়ের, তৃণমূলের, জমিয়তে উলেমা হিন্দের এবং কংগ্রেসের। এই দুই পাবলিক কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তের কোনও তোয়াক্কা না করেই তৃণমূল বারবার উপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপাতে চেয়েছে। সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির দাবি হচ্ছে, সব চাষীকেই জমি ফেরত দিতে হবে। অথচ তৃণমূল বলছে, চেক যারা নেয়নি শুধু তাদের দিলেই চলবে। নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তাদের উপস্থিতি ছাড়া কোনও আলোচনা হতে পারে না। অথচ এই কমিটির মতামত না নিয়ে এবং না জানিয়ে নেতৃত্বের নির্দেশে তৃণমূলের এক তরুণ এম এল এ নন্দীগ্রামের সকল আক্রমণের মূল হোতা সিপিএম নেতাদের সাথে ৩১ মে বৈঠক করেছেন এবং তৃণমূল নেত্রীও কলকাতায় বৈঠক করছেন। তৃণমূলকে এই অধিকার কে দিল? এটা কি আন্দোলনবিরোধী নয়?

জনগণকে জানাতে চাই, সিঙ্গুরে-নন্দীগ্রামে লড়াই করেছে জনগণ। আর উভয় জায়গার জনগণই জানেন, দুই জায়গাতেই আন্দোলন প্রথম সংগঠিত করেছে এস ইউ সি আই, তৃণমূল নেমেছে পরে। অথচ বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম শ্রেণীস্বার্থে তৃণমূলের হয়ে ফলাও প্রচার করেছে, যেন তারাই সবকিছু করছে, আর এস ইউ সি আই-সহ অন্যান্যদের যেন বিশেষ কোন অস্তিত্বই নেই। মালিকশ্রেণী নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলির স্থানীয় প্রতিনিধিরা এ নিয়ে বারবার অসহায়তা ব্যক্ত করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এস ইউ সি আই উদ্যোগ না নিলে এবং নিচু স্তরে গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী না গড়ে তুললে এই আন্দোলন এত ব্যাপকতা ও স্থায়িত্ব পেত না এবং সাহস ও নৈতিকতা নিয়ে এভাবে মাথা তুলতে পারত না। ওখানকার জনগণই এর সাক্ষ্য দেবে। তাই এস ইউ সি আই সম্পর্কে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি সকলেই অত্যন্ত আতঙ্কিত। তাই তারা অতি সতর্ক, যাতে এস ইউ সি আইয়ের এই ভূমিকা জনগণ জানতে না পারেন। ঠিক এভাবেই স্বদেশী আন্দোলনে দেশীয় পুঁজিবাদ ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের প্রতিনিধি ক্ষুদিরাম-সূর্য সেন-ভগৎ সিং-নেতাজীদের সম্পর্কে এ দেশের জনগণকে জানতে দিতে চায়নি; প্রচার দিয়ে দিয়ে সামনে এনেছিল তাদের নির্ভরযোগ্য আপসকামী গান্ধীজী-নেহেরু-প্যাটেলদের।

নন্দীগ্রামে ও সিঙ্গুরে দাবি পুরোপুরি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হবে। অন্যদিকে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের নানা দাবিকে কেন্দ্র করে বারবার লড়াইয়ের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে এবং আরও দেখা দেবে। রাষ্ট্র এবং সরকার আরও নির্মম ফ্যাসিস্ট কায়দায় দমনপীড়ন চালাবে। যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, বারবারই এসব ঘটতে থাকবে। আক্রমণগুলিকে রুখতে হলে, দাবিগুলি আদায় করতে হলে, মূল লক্ষ্য পুঁজিবাদী শোষণকে উচ্ছেদ করতে হলে চাই সঠিক বিপ্লবী আদর্শ, সংগ্রামী কর্মসূচি, উন্নত নৈতিক বলে বলীয়ান নিম্নস্তর থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন স্তর পর্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী। এই শিক্ষাই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, কোনও দলকে, কোনও নেতা-নেত্রীকে অন্ধভাবে সমর্থন নয়, বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। না হলে বারবার ঠকতে হবে। আশা করি জনসাধারণ এ কথাগুলি ভেবে দেখবেন। যারা এম এল এ, এম পির সংখ্যা দিয়ে ও সংবাদমাধ্যমের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তৃণমূলকেই একমাত্র ভরসা ভাবছেন এবং তৃণমূলের পেছনে ছুটছেন, তাঁদেরও ভেবে দেখতে হবে, আজ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণআন্দোলনের অগ্নিপরীক্ষায় তৃণমূলের কোন চরিত্র ধরা পড়েছে। এ দলের উপর কি আর নির্ভর করা যায়?

তাই গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামগুলি সঠিক ভাবে গড়ে তোলা ও পরিচালনার স্বার্থে এবং জনগণের কাম্য যথার্থ সংগ্রামী অপজিশন গড়ে তোলার প্রয়োজনে আজ এস ইউ সি আইকে অতি দ্রুত আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের আবেদন এস ইউ সি আইকে সক্রিয়ভাবে সমর্থনে এগিয়ে আসুন। আশা করি, সকলেই এ কথাগুলি ভেবে দেখবেন।

৭/৬/০৭

মৈপীঠে মহিলা সম্মেলন

একটানা দীর্ঘ ২০ বছর সিপিএমের বর্বর অত্যাচারে জর্জরিত দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠ অঞ্চলের গরিব মানুষ পুনরায় এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে জাগছে। এক্ষেত্রে আক্রান্ত মা-বোনেদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত ২৭ মে সমস্ত প্রকার ভয়, সন্ত্রাস উপেক্ষা করে সহস্রাধিক মহিলা মৈপীঠ পাঁচমাথার মোড়ে এ আই এম এস এস আয়োজিত ২য় আঞ্চলিক মহিলা সম্মেলনে সমবেত হলেন। ঠিক ২০ বছর আগে ১ম মহিলা সম্মেলনের পরের দিন সিপিএমের ঘাতকবাহিনীর গুলিতে নিহত ১৩/১৪ বছরের কিশোরী শহীদ পূর্ণিমা ঘোড়ুই নামাঙ্কিত মঞ্চে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শুরুর আগে সিপিএমের ঘাতকবাহিনীর হাতে নিহত এই এলাকার শহীদদের এবং সাম্প্রতিক জমি অধিগ্রহণবিরোধী আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মরণে স্থাপিত শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড অনিতা মুখার্জী। এরপর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের কাজ শুরু হয়। এই সম্মেলনের সভানেত্রী নির্বাচিত হন ’৮০র দশকের লড়াকু প্রবীণ মহিলাকর্মী কমরেড যমুনা মণ্ডল। এরপর সর্বহারার মহান নেতা এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতটি পরিবেশিত হয়। সম্মেলনে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড গীতা জানা। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে এবং সিপিএমের অত্যাচারের ভয়াবহতা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কমরেড গৌরী মণ্ডল সহ আরো অনেকে। প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে এই অধিবেশনে সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড মাধবী প্রামাণিক। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে কমরেড মাধবী পণ্ডিতকে সভানেত্রী ও কমরেড গৌরী মণ্ডলকে সম্পাদিকা করে ১৮ জনের কার্যকরী কমিটি ও ৫২ জনের সাধারণ কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনের প্রধান বক্তা কমরেড অনিতা মুখার্জী মৈপীঠের মা-বোনদের সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর ভাষণে বলেন, অতীতে এই কুলতলি এলাকার মা-বোনেরা বহু লড়াইয়ের সাক্ষী এবং বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁরা একটার পর একটা বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশপাশি এ রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে মা-বোনেদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীদিনে লড়াইয়ের সৈনিক হিসেবে মৈপীঠের ঘরে ঘরে মা-বোনেরা সংগঠিত হবেন — এই আহ্বান তিনি জানান। সম্মেলনে আগত মহিলারা নন্দীগ্রাম ত্রাণ তহবিলে ৪০৮ টাকা সাহায্য করেন। সম্মেলন শেষে বড় পর্দায় সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের চাষীদের ওপর পুলিশী অত্যাচারের সিডি দেখানো হয়। মহিলারা সহ প্রায় ২/৩ হাজার মানুষ এই তথ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখে সিপিএমের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় ফেটে পড়েন।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

স্নাতকস্তরে ভর্তির জটিলতা কর্তৃপক্ষই সৃষ্টি করেছে

— এ আই ডি এস ও

স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে যে জটিলতা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল ৭ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তথাকথিত গ্রেডেশন ও অবৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করার ফলে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা স্নাতক স্তরে ভর্তি হতে গিয়ে চরম হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। তাদের চালু করা গ্রেডেশনের কার্যকারিতা কী, তা বোধহয় সংসদের সভাপতিও বলতে পারবেন না। অন্যদিকে সামগ্রিক নম্বরের যোগফল না থাকায়, সামগ্রিকভাবে যে ছাত্র বেশি নম্বর পেয়েছে তাকে পিছনে ফেলে পাঁচটি বিষয়ে বেশি নম্বর পাওয়া, অথচ সামগ্রিকভাবে কম নম্বর পাওয়া ছাত্র স্নাতক স্তরে ভর্তির সুযোগ পাবে। এ রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার এরকম মূল্যায়ন পদ্ধতি ও গ্রেডেশনকেই সর্বভারতীয় স্তরের সমমান সম্পন্ন বলছে এবং একেই শিক্ষার অগ্রগতি বলে বড়াই করছে।

এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে আমরা প্রথম থেকেই এই গ্রেডেশন প্রথা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ক্ষতিকর দিকটি তুলে ধরে তা চালু করার বিরোধিতা করেছিলাম। রাজ্য সরকার জনমতের কোন তোয়াক্কা না করে একতরফা তড়িঘড়ি এই প্রথা চালু করে কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে চরম অসুবিধায় ফেলেছে।

অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ভর্তির নিয়মাবলী প্রথমেই স্পষ্টভাবে ঘোষণা না করে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার পর তা ঘোষণা করায় ভর্তি সমস্যা আরও জটিল হয়েছে।

ভবিষ্যতে ছাত্রদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধের জন্য অবিলম্বে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে এই গ্রেডেশন প্রথা বন্ধ করে ছাত্র-শিক্ষক সংগঠনগুলির ও শিক্ষাবিদদের মতামতের ভিত্তিতে মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করার দাবি জানাচ্ছি।

ইলিশ সংরক্ষণের সরকারি প্রতারণার বিরুদ্ধে মৎস্যজীবীদের বিক্ষোভ-ডেপুটেশন

ইলিশ মাছ সংরক্ষণের নামে মৎস্যজীবীদের প্রতি সিপিএম সরকার ও মৎস্যমন্ত্রী যে হুমকি দিয়েছেন — তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পাঁচ সহস্রাধিক মৎস্যজীবী গত ২৮ মে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিসারমেন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে ডায়মণ্ডহারবারে এ ডি এফ (মেরিন)-এর অফিসে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হন এবং এ ডি এফকে তাদের সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করান।

৫০০ গ্রামের নীচে ইলিশ সহ ছোট মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে মৎস্যদপ্তরের দেওয়া সার্কুলার এবং গত ১৬ মে নামখানা ও ১৭ মে ডায়মণ্ডহারবারে মৎস্য সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা শিবিরে মাননীয় মৎস্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশ মৎস্যজীবীদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। কোনও ফিশিং বোটে বা মাছের আড়তে কম ওজনের মাছ দেখলে তাদের লাইসেন্স বাতিল সহ ঐ বোটের মৎস্যজীবী আড়তদারকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে মৎস্যমন্ত্রী হুমকি দেন। অথচ সকলেই জানেন যে, জাল দিয়ে মেপে মেপে মাছ ধরা যায় না। আর এই ধরনের কোন প্রশিক্ষণও সরকার মৎস্যজীবীদের দেয়নি। তাই মৎস্যজীবীরা মৎস্য সংরক্ষণের প্রয়োজনে ৫০০ গ্রামের উর্ধ্বে ওজন করে মাছ ধরার সিদ্ধান্ত বাতিল করে জালের ফাঁস ৭৫ মিলিমিটারে বেঁধে দেওয়ার দাবি বহুদিন থেকে করে আসছে। এই প্রথা চালু হলে কিছু ছোট ইলিশ সহ অন্যান্য মাছ যেমন বাঁচবে, তেমনি বাঁচবে মৎস্যজীবীরাও। কিন্তু এই দাবির প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে মৎস্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ মৎস্যজীবীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করে।

মৎস্যজীবীরা মনে করেন যে, শুধু ছোট মাছ বা ছোট ইলিশ ধরা বন্ধ করলেই মৎস্য সংরক্ষণ হবে না। কারণ, একদিকে হিমালয় থেকে আগত মিষ্টি জলের ধারা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ইলিশের ডিমপাড়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার অত্যাধুনিক হাজার হাজার ট্রলার যথেচ্ছ ফিশিং; সমুদ্রের মাঝে যুদ্ধ মহড়া সহ বোমচার্জ; নদী ও সমুদ্রবক্ষে বড় বড় জাহাজ, কলকারখানা, মাছের ঝিল প্রভৃতি থেকে বিষাক্ত জল সহ রাশি রাশি বর্জ্য পদার্থ ফেলা প্রভৃতি কারণেই মৎস্য সংরক্ষণে আজ প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই সকল কারণেই দিনে দিনে নদী ও সমুদ্র মৎস্যশূন্য হয়ে যাচ্ছে। তাই এই সমস্যাগুলির সমাধান না করে ৫০০ গ্রামের নীচে ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ করার নির্দেশকে কিছুতেই মানতে পারছেন না মৎস্যজীবীরা। এই সকল অন্যায়ের প্রতিবাদে এবং মৎস্য সংরক্ষণের জন্য ওজন প্রথা বাতিল করে জালের ফাঁস নির্দিষ্ট করে দেওয়া, সহজ উপায়ে প্রত্যেক মৎস্যজীবীকে পরিচয়পত্র দেওয়া, শুধু কো-অপারেটিভ নয় — যে কোন তেলপাম্প থেকে মৎস্যজীবীদের ডিজেলে সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং নদীখাড়ি ও সমুদ্রে মাছ ধরার অধিকার বহাল রাখার দাবিতে ডায়মণ্ডহারবার মুক্তাঙ্গন থেকে মৎস্যজীবীরা সুসজ্জিত বিশাল মিছিল নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার শহর পরিক্রমা করে মৎস্য দপ্তরে গিয়ে অবস্থান করেন। এরপর সংগঠনের সম্পাদক বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের শাখা সংগঠনগুলি থেকে আসা ১১ জনের এক প্রতিনিধি দল এডিএফের সাথে দেখা করে। এডিএফ মৎস্যজীবীদের দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং ডিএম-কে সভাপতি করে মৎস্যমন্ত্রী, এস পি, বিএসএফ, কোস্ট গার্ড, বনদপ্তর, মৎস্যজীবী এলাকাগুলির ৪ জন বিধায়ক ও মৎস্যজীবীদের কয়েকটি বড় সংগঠনকে নিয়ে পূর্বে গঠিত কমিটিকে ৭ দিনের মধ্যে ডেকে উক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন ও যতদিন সমাধান না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের ওপর প্রশাসনিক কোন হামলা হবে না বলেও তিনি আশ্বাস দেন। এরপর এডিএফ বাইরে এসে অবস্থানরত হাজার হাজার মৎস্যজীবীর কাছে প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেন। এই বিষয়টি সমগ্র মৎস্যজীবী সহ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করে। পরিশেষে, আন্দোলন ঠিকভাবে চালালে দাবি যে আদায় হয়, এই বিশ্বাস নিয়ে মৎস্যজীবীরা এলাকায় ফিরে যান।

মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের মালদা জেলা সম্মেলন

৪ জুন প্রায় দেড় সহস্রাধিক মোটরভ্যান চালকের এক বিশাল মিছিল মালদা শহরে সাড়া ফেলে দেয়। ইউ টি ইউ সি-এল এস অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের উদ্যোগে সংগঠিত এই মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলা সদর দপ্তরে উপস্থিত হয় এবং দাবিসনদ পেশ করে। দাবি জানানো হয়, সমস্ত

মোটরভ্যান চালককে সরকারি লাইসেন্স দিতে হবে, চালকদের ওপর পুলিশের জুলুম হয়রানি বন্ধ করতে হবে, দুর্ঘটনাজনিত বিমা প্রকল্প চালু করতে হবে, তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন স্কিমের আওতায় আনতে হবে ইত্যাদি।

মিছিলের আগে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে সংগঠনের মালদা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুজিত ভট্টশালী ও রাজ্য সহসভাপতি কমরেড গোপাল নন্দী।

রাজ্যের প্রায় ৭০ হাজার মানুষ এই পেশার সাথে যুক্ত। এই মোটরভ্যান চালকদের বৈধ লাইসেন্স দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা সরকার করেনি। ফলে এদের ওপর পুলিশ-প্রশাসন জুলুম ও হয়রানি চালাচ্ছে। মোটরভ্যান সহ চালককে আটকে রাখছে ও মিথ্যা কেস দিয়ে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। আবার কোথাও পুলিশ এদের থেকে মাসিক টাকা চাইছে, টাকা না পেলেই আটক করছে। বহু মোটরভ্যান চালক পুলিশের ভয়ে রাস্তায় বের হতে পারছেন না। পরিবার নিয়ে অনাহারে দিনাতিপাত করছেন।

এরূপ অবস্থা মোটরভ্যান শ্রমিকরা চায় স্বাধীনভাবে বৈধ লাইসেন্স সহ গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে। বিভিন্ন জেলায় কিছু পঞ্চায়েত এদের কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়ে লাইসেন্স দিচ্ছে। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন তাও মানছে না। তাই মোটরভ্যান চালকরা বৈধ লাইসেন্স দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন।

সম্মেলনে আব্দুস সামাদকে জেলা সম্পাদক ও গোপাল নন্দীকে সভাপতি করে ৩৫ জনের এক শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়।

ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপারদের মহাকরণ অভিযান

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এবং অফিসে ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী মাত্র ১৭৫ টাকা মাসিক বেতনে ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল দেওয়া, কর্তৃপক্ষের ফাইফরমাস খাটা, নোটিশ বিলি, ফাইল বওয়া সহ বিভিন্ন ধরনের কাজ দীর্ঘ বছর ধরে করে আসছেন। এদের না আছে ডিএ, না আছে বোনাস, না আছে কোনও সামাজিক নিরাপত্তা। অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ ডি এ মূল বেতনে সংযুক্ত হওয়ায় অল্প কিছু বেতন বাড়লেও এদের জন্য সরকার কিছুই করেনি। এই নামমাত্র বেতনও মাসে মাসে দেওয়া হয় না। অথচ কোনওভাবে অফিস কামাই করার উপায় নেই। একদিন ঝাঁট-জল দেওয়া বন্ধ হলে অফিস অচল হয়ে পড়ে। অনেক অফিসে জলের কল নেই। অন্যের বাড়ি থেকে জল আনতে গেলে কথা শুনতে হয়। অথচ ১৭৫ টাকা বেতনে এদের সংসার চলা তো দূরের কথা, যাতায়াতের ভাড়া গুনতেই তা শেষ হয়ে যায়।

অর্থমন্ত্রকের ১৯৯৯ সালের এক নির্দেশে এদের বেতন ন্যূনতম ৭০০ টাকা দেওয়ার কথা বলা হলেও বহু দপ্তরে তা দেওয়া হয় না। ৭০০ টাকাও আজকের দিনে কোনও বেতন হতে পারে না। তাই অর্থমন্ত্রকের উক্ত নির্দেশকে আজকের উপযোগী করে এদের বেতন অন্তত মাসিক ৩০০০ টাকা হওয়া দরকার। জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ এ্যাকশন (জেপিএ)-র উদ্যোগে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় এদের সংগঠিত করে 'সারা বাংলা ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার কর্মচারী সমন্বয় সমিতি' গড়ে তুলে আন্দোলন করার ফলেই এদের বেতন ৬০ টাকা থেকে ১৭৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ন্যূনতম বেতন ৩০০০ টাকা সহ এদের নিয়মিতকরণ করা, বায়োডাটা সহ গ্রেডেশান তালিকা প্রকাশ করা, মাসের প্রথম তারিখে বেতন দেওয়া, আজকের উপযোগী বেতনহার নির্ধারণ করে অর্থদপ্তরের নতুন নির্দেশের মাধ্যমে তা রাজ্যের সমস্ত অফিসে কার্যকর করা, কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়া ইত্যাদি দাবিতে পাঁচ শতাধিক ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার কর্মচারী ৭ জুন সুবোধমল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে মহাকরণ অভিযান করেন।

পুলিশ বাধা দিলে মেট্রো চ্যানেলে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমন্বয় সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী। বক্তব্য রাখেন সমন্বয় সমিতির সম্পাদক ও জেপিএ-র সহসভাপতি বিমল জানা। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দিলীপ চক্রবর্তী, মধু বেরা ও জেপিএ'র সম্পাদক তারকনাথ দাস, ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপারদের বিশিষ্ট নেতা সেখ অরুণ, গৌর দাস প্রমুখ। জেপিএ নেতা বিমল জানার নেতৃত্বে ৪ জনের এক প্রতিনিধিদল অর্থমন্ত্রী ও অর্থদপ্তরের প্রধান সচিবের নিকট ৯ দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করেন। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিবের নিকটও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন — দাবি না মিটলে পরবর্তীকালে গণঅনশন, আইন অমান্য প্রভৃতি কর্মসূচি নেওয়া হবে।

অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে

সেমিনার

বিষয় ঃ জি এম বীজজাত পণ্য ও কৃষি-কৃষক-পরিবেশ-জনস্বাস্থ্য

২৩ জুন, মহাবোধি সোসাইটি হল, বিকাল ৪টা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in